অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীর

গ্রন্থাবলী

১। IRON IN ANCIENT INDIA ... Rs. 2/4
(To be had at the Indian Association for the Cultivation of Science, No. 210 Bowbazar Street, Calcutta)

২। PRACTICAL INORGANIC CHEMISTRY Re. 1.
(To be had of all principal book-sellers.)

৩। আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য-রসায়ন (প্রথম ভাগ) ... ১।০
বাঁধাই ১॥০

৪। বৈজ্ঞানিক-জীবনী (প্রথম ভাগ) ... ১।০
বাঁধাই ১॥০

৫। তুফান (Humorous Essays) ... (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বৈজ্ঞানিক-জীবনী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম, এ, এফ, সি, এস,

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার,

রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস, ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১।০, বাঁধাই ১॥০

প্রকাশক

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

রাজসাহী।

কান্তিক প্রেস,

২২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য

ও

বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিকল্পে

দানে মুক্তহস্ত

কাশিমবাজাবের মাননীয়

মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের

করকমলে

গ্রন্থকারের আন্তরিক শ্রদ্ধার

নিদর্শনস্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গ্রন্থকাব কর্তৃক

সাদরে

অর্পিত হইল।

ভূমিকা

এই গ্রন্থখানিতে আমি একদিকে সুশ্রুত, নাগার্জ্জুন, আর্য্যভট্ট প্রভৃতি প্রচীন ভারতীয় ও গেলিলিও, নিউটন প্রভৃতি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্ত ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত পবিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণেব জীবনবৃত্তান্ত ও কার্য্যাবলী সুবিদিত কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের কার্য্যাবলী স্বল্পবিদিত বা অজ্ঞাত। সেই কারণে এই দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্তের লিখনপদ্ধতির মধ্যে একটু বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইবে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্তগুলি একটু অসরল হইয়া পড়িয়াছে।

যেমন কবিতা সম্যক বুঝিতে হইলে কবিকে জানা আবশ্যক, সেইরূপ কোনও বৃহৎ বৈজ্ঞানিক সত্য সম্যক বুঝিতে হইলে উহার আবিষ্কারককে জানা উচিত। কিরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে সেই সত্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলেন তাহার বর্ণনা কেবল কৌতূহলোদ্দীপক নহে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপাদানও বটে। সেইজন্য প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিবার সময় তাঁহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি, ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিচয় দিতে প্রয়াস পাই নাই; যে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জন্য তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ

সেই সত্য কিরূপে তিনি ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন তাহার বিষদ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই গ্রন্থখানিতে মাত্র কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের কার্য্যাবলীর পরিচয় আছে। ইহার দ্বিতীয় ভাগে ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি ভারতীয় ও জন ওয়াট, লিনিয়স, ওয়ালার, কেলভিন প্রভৃতি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার ইচ্ছা আছে।

গ্রন্থখানির একটা ছোটগোছের নাম রাখিবার জন্য "বৈজ্ঞানিক জীবনী" নামকরণ করিয়াছিলাম। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব বলিতেছেন যে নামটা "বৈজ্ঞানিক-জীবনী" হইবে, কারণ তাহা না হইলে "বৈজ্ঞানিক" শব্দটা "জীবনী"র বিশেষণ হইয়া পড়ে। তাঁহাদের আপত্তিই ঠিক। যদি কোনোও কালে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের আবশ্যক হয় তাহা হইলে অন্যান্য সংশোধনের সহিত এই ভুলটিও সংশোধিত হইবে।

এই গ্রন্থখানি গত দুই বৎসর ধরিয়া "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। "ভারতী"র মাননীয়া সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী গ্রন্থের তাবৎ ব্লকগুলি আমাকে দান করিয়া বাধিত করিয়াছেন। পুনশ্চ আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিতেছি যে কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই পুস্তক প্রকাশের জন্য অর্থসাহায্য করিয়াছেন।

রাজসাহী
১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

সূচী

বৈজ্ঞানিক জীবনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুশ্রুত।

সে বহু শতাব্দীর কথা, যখন ভারতে স্বাধীন চিন্তার স্রোত অপ্রতিহতভাবে বহিয়া যাইতেছিল, যখন আপ্তবাক্যের উপর আস্থা স্থাপন করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও প্রত্যক্ষের অমর্যাদা কখনই হইত না, যখন অনুষ্ঠানের দুর্ভেদ্য কারাগারের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীর ন্যায় নিশ্চলভাবে মৃতবৎ অবস্থান করিত না -সেই হিন্দুর স্বাধীন চিন্তার যুগে মহর্ষি সুশ্রুত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যে যুগে অস্ত্রচিকিৎসা নবসুন্দরের নিজস্ব সম্পত্তি হইবার কল্পনাও অসম্ভব ছিল, যে যুগে মৃত শরীর-স্পর্শ ও শবব্যবচ্ছেদ একটা গুরুতর পাপের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত না, যে যুগে প্রবচন অপেক্ষা বাস্তবের সমাদর অধিক

ছিল, সেই যুগে ধন্বন্তরিশিষ্য সুশ্রুত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হায়! মহর্ষি বড় আশা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন "কুশলেনাভিপন্নং তদ্ বহুধাভিপ্রবোহতি"- তাহার সে আশা ফলবতী হয় নাই। ভারতের অদৃষ্ট দেবতার বৈগুণ্যে তিনি যে বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা অঙ্কুরিত না হইয়াই অকালে শুকাইয়া গিয়াছে। প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পরে যখন হিন্দুসন্তান আবার মৃত শরীর ব্যবচ্ছেদের জন্য অস্ত্রধারণ করাতে ইংরাজের বিজয়দুর্গ হইতে মহানন্দসূচক তোপধ্বনি হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য সেই ভাগ্যবান যুবক স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা রূপে পূজিত হইয়াছিল জানি না হিন্দুর চিন্তাশক্তির অধোগতির এই জ্বলন্ত উদাহরণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে মহর্ষি সুশ্রুতের হৃদয় ক্ষোভে ও অপমানে ফাটিয়া যাইত কি না।

শারীরবিদ্যার উৎপত্তি।

সুশ্রুত-সংহিতায় যে উন্নত শারীরবিদ্যা ও অস্ত্রচিকিৎসার পরিচয় পাই তাহার উৎপত্তি বৈদিক সাহিত্যে। যেমন অথর্ব্ববেদ কায়চিকিৎসার আদিগ্রন্থ, সেইরূপ সামবেদ অস্ত্রচিকিৎসার উৎপত্তিস্থল। বৈদিক কালে বিবিধ পশুযাগযজ্ঞে নিহত পশুর বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হইত। "নিহত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শাসনামক ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া পৃথক করা হইত। যে ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিত তাহার নাম শমিতা। যজ্ঞভূমির সংলগ্ন যে স্থানে এই কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইত সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেইখানেই অগ্নি জ্বালিয়া পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাক করা হইত। যে অগ্নিতে পাক হইত, তাহার

নাম শামিত্র অগ্নি।” (১) এইরূপে পশুর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জ্ঞান হইতে পরবর্ত্তীকালের শারীরবিদ্যার উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও শ্রৌতসূত্র রচনাকালে এই সকল যজ্ঞের যেমন বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে, নিহত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভাগ তেমনই আরও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া আসিয়াছে। বেদোক্ত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জ্ঞান হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় অঙ্গবিনিশ্চয়বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে এবং বেদোক্ত অনেক পরিভাষিক শব্দ আয়ুর্ব্বেদে গৃহীত হইয়াছে।

সুশ্রুতের আবির্ভাব-কাল।

সুশ্রুত স্বর্গবৈদ্য ধন্বন্তরির অবতার কাশীরাজ দিবোদাসের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম। সুশ্রুত, ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত, নিমি, কাঙ্কায়ন, গার্গ্য ও গালব এই দ্বাদশ জন কাশীরাজের শিষ্য ছিলেন। ইহাদের অনেকেই নিজ নিজ নামে ভিন্ন ভিন্ন শল্যতন্ত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলি এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল সুশ্রুতসংহিতাই প্রচলিত আছে। কিন্তু এককালে যে এই সকল শল্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। টীকাকার শিবদাস চক্রদত্ত-সংগ্রহের টীকায় গোপুররক্ষিত ও বৈতরণ কর্ত্তৃক লিখিত শল্যতন্ত্র

---

(১) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত “শরীরবিজ্ঞান পরিভাষা” প্রবন্ধ—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তদশ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৮,২০৫। এই প্রবন্ধে রামেন্দ্র বাবু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মাধ্যন্দিন বাজসনেয়ী সংহিতা, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ও আপস্তম্ভ শ্রৌতসূত্র হইতে পশুযজ্ঞে নিহত পশুর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৈদিক পরিভাষা সঙ্কলন করিয়াছেন।

হইতে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। সুশ্রুতের টীকাকার চক্রপাণি সুশ্রুত-সংহিতার টীকায় পৌষ্কলাবততন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণি একাদশ খ্রীষ্টাব্দের আয়ুর্ব্বেদকার, শিবদাস তাঁহারও পরে, অতএব দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও এই সকল তন্ত্র প্রচলিত ছিল।

সুশ্রুতের আবির্ভাবকাল সঠিক নির্ণীত হয় নাই। "সুশ্রুতেন প্রোক্তং সৌশ্রুতং" এই বার্ত্তিকসূত্র অনুযায়ী সুশ্রুত খ্রীষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। নবাবিষ্কৃত বাউয়ার পাণ্ডুলিপি পাঠে জানা যায় যে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুশ্রুত অতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদকার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। আধুনিক সুশ্রুতসংহিতা দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত প্রাচীন সুশ্রুতসংহিতা। টীকাকার ডল্লনাচার্য্যের মতে নাগার্জ্জুন সুশ্রুতসংহিতার উত্তরতন্ত্রের রচয়িতা। সুশ্রুতের পর কয়েক শতাব্দী শল্যবিদ্যা সজীব ছিল। বাগ্‌ভটের (তৃতীয় শতাব্দী) সময় শল্যবিদ্যা যে বিদ্যমান ছিল তাহা তাঁহার অষ্টাঙ্গ পাঠে বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কিন্তু বাগভটের পর হইতে ক্রমশঃ অঙ্গবিনিশ্চয়বিদ্যা ও শল্যবিদ্যার অবনতি ঘটিতে থাকে। ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি বলিয়া মনে হয় ঃ---

প্রথম---বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির সহিত ভারতে স্বাধীন চিন্তার উন্নতি বহুলপরিমাণে সাধিত হইলেও "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই নৈতিক বাক্য শবব্যবচ্ছেদের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই জন্য কায়চিকিৎসা বিশেষতঃ তান্ত্রিকচিকিৎসাপদ্ধতির বহুল উন্নতি সাধিত হইলেও বৌদ্ধযুগে অস্ত্রচিকিৎসা বড়ই অনাদৃত হইতে চলিয়াছিল।

দ্বিতীয়—পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণই অন্য অন্য বিদ্যার ন্যায় চিকিৎসা-বিদ্যার পঠনপাঠন করিতেন। মনুব অনুশাসন হইতে আরম্ভ করিয়া শবদেহস্পর্শ ক্রমশঃ একটা পাপের কার্য্যে পরিণত হইয়া আসিতেছিল, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। শবদেহস্পর্শ ও ব্যবচ্ছেদ ব্যতিরেকে অঙ্গবিনিশ্চয় ও অস্ত্রচিকিৎসা-বিদ্যা কখনই সজীব থাকিতে পারে না। সেইজন্য এই "শুচি" শাসনের পরিণাম এই হইয়াছে যে ক্রমশঃ ভারতের উন্নত অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা নিম্নশ্রেণীর অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই মহাত্মা এলিফিনষ্টোন সাহেব এখনকার স্বদেশীয় অস্ত্রচিকিৎসার অবনতি দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"bleeding has been left to the barber, bone-setting to the herdsman and the application of blisters to every man."

সুশ্রুতোক্ত শারীরবিদ্যা।

সুশ্রুতোক্ত অঙ্গবিনিশ্চয়বিদ্যার সম্যক পরিচয় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রদান করা অসম্ভব। সুশ্রুতের শারীরস্থান পাঠ করিলে স্বতই মনে হয় যে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম বিবরণগুলি প্রত্যক্ষ দর্শন ভিন্ন একেবারে অসম্ভব ছিল। সুশ্রুত সপ্ত, ত্বক (skin, epidermis), সপ্ত কলা (celluar tissues and fascia of the body), সপ্ত আশয় (organs or receptacles), অন্ত্র (intestines), নয়টি দ্বার, ষোলটি কণ্ডরা (রজ্জুবৎ শিরা), বারটি জাল (membranes), ছয়টি কূর্চ্চ, চারিটী রজ্জু (tendons), সাতটি সেবনী (sutures), তিন শত অস্থি

(bones), দুই শত দশটি অস্থিসন্ধি (bone joints), নয় শত স্নায়ু (nerves), পাঁচ শত পেশী (muscles), সাত শত শিরা ও এক শত সাত মর্ম্মস্থানের (vital parts) সূক্ষ্ম বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শরীরের কোন স্থানে কয়টি স্নায়ু, অস্থি, শিরা প্রভৃতি আছে তাহাও সঠিক নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিন শত অস্থির বিবরণ দেখুন—

প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া	১৫টি
পা বা গোড়ালিতে	১০টি
জঙ্ঘায়	১টি
জানুতে	২টি
উরুদেশে	১টি
এইরূপ অপর পায়ে	৩০টি
দুই হাতে ৩০ করিয়া	৬০টি
কটিদেশে	১টি
মলদ্বারে	১টি
যোনিদেশে	১টি
দুই নিতম্বে	২টি
পৃষ্ঠে	৩০টি
দুই পার্শ্বে ৩৬টি করিয়া	৭২টি
বক্ষে	৮টি
বৃত্তাকার অক্ষক নামক	২টি
গ্রীবাদেশে	২টি
কণ্ঠদেশে	৯টি
দুই হনুতে	৪টি
দন্তে সর্ব্বসমেত	৩২টি
নাসিকায়	৩টি
তালুতে	১টি
কর্ণ, গণ্ড ও শঙ্খদেশে ২টি করিয়া	৬টি
মস্তকে	৬টি
সর্ব্বসমেত	৩০০ অস্থি

১৬২৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হার্ভে দেহের মধ্যে রক্তের গতি (circulation of the blood) আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হার্ভের বহু শতাব্দীর পূর্ব্বে সুশ্রুত যে রক্তের গতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—এ সংবাদ ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণের কর্ণে ভাল করিয়া পেবেশ করে নাই। রক্তের গতি সম্বন্ধে সুশ্রুত লিখিয়া

গিয়াছেন যে "১৭৫টি রক্তবাহিনী শিরার দ্বারা রক্ত সমগ্র দেহে চলাচল করিতেছে। এই সকল শিরা যকৃৎ ও প্লীহা হইতে উদ্গত হইয়া সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। শোণিত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যতক্ষণ স্বীয় শিরামধ্যে বিচরণ করে (circulates) ততক্ষণ ধাতুসমুদায়ের পূরণ, বর্ণের উজ্জ্বলতা, স্পর্শজ্ঞানের তীক্ষ্ণতা এবং অন্যান্য নানাপ্রকার গুণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই রক্ত দূষিত হইলে, রক্তজন্য নানাপ্রকার পীড়া জন্মে।" রক্তের গতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারী বলিয়া হার্ভের নাম গৌরবান্বিত, কিন্তু রক্তের গতির আবিষ্কার প্রথমে ভারতে হইয়াছিল এ গৌরব ভারতবাসী নিঃসন্দেহে করিতে পারেন।

ভারতীয় অস্ত্রচিকিৎসার প্রাধান্য।

দুই এক পৃষ্ঠার মধ্যে সুশ্রুতোক্ত অস্ত্রচিকিৎসার সম্যক বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর নহে, তবে সুশ্রুতের সময় অস্ত্রচিকিৎসা কিরূপ উন্নত ছিল তাহার আভাষমাত্র পাঠককে প্রদান করাই লেখকের উদ্দেশ্য। রামায়ণ ও মহাভারতে দেখিতে পাই যে উপযুক্ত অস্ত্র-চিকিৎসকগণ সেনাসমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। রাবণের সহিত যুদ্ধে রামের সৈন্যবর্গের অস্ত্রচিকিৎসকরূপে সুশেন রামের সহিত লঙ্কায় গিয়াছিলেন। মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্ব্বে দখিতে পাই যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন উভয়েই অস্ত্র-চিকিৎসক ও অস্ত্রচিকিৎসার উপযুক্ত বন্ধনী (bandage), ঔষধাদি সংগ্রহ করিতেছেন। পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম নকুল অস্ত্রচিকিৎসাবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। গো, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত সংস্কৃতভাষা ও ভারতের

চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রায় একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে অস্ত্রচিকিৎসাবিজ্ঞানে ভারত অনেক বিষয়ে ইউরোপের শিক্ষাগুরু। ওয়েবার লিখিয়া গিয়াছেন "ইউরোপের আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসকগণ হিন্দুদের নিকট হইতে একস্থান হইতে চর্ম্ম লইয়া অন্যস্থানে চর্ম্ম সংযোগ করিবার উপায়, যথা কর্ত্তিত নাসিকা জোড়া দেওয়া, (rhinoplasty) শিক্ষা করিয়াছেন।" প্রসিদ্ধ জার্ম্মান ডাক্তার হির্সবার্গ (Dr. Hirschserg) ওয়েবার সাহেবের পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সমর্থন করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে "চক্ষের ছানিতোলা প্রক্রিয়া ইউরোপ ভারতবাসীর নিকট শিখিয়াছে, এবং প্রাচীন গ্রীক, মিশরবাসী বা অন্য কোন জাতি উহা জ্ঞাত ছিলেন না।" আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসকগণ অসাধ্যসাধন করিতেছেন, কিন্তু অধুনা যে সকল অস্ত্রচিকিৎসা অতি কঠিন বলিয়া স্বীকৃত হয় (major operation) তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি; যথা—ছানিতোলা, অঙ্গছেদন (amputation), উদর বিদারণ (abdominal section) প্রাচীন ভারতে অবিদিত ছিল না। আধুনিক পাশ্চাত্য অস্ত্রবিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়া সকলেরই চমৎকৃত হইবার কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতের উন্নত অস্ত্রচিকিৎসার গৌরবের যে আমরা উত্তরাধিকারী তাহা যেন কদাচ ভুলিয়া না যাই।

সুশ্রুতোক্ত অস্ত্রচিকিৎসা।

১। শিক্ষা

সুশ্রুত অস্ত্রচিকিৎসা আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) ছেদ্যক্রিয়া (কোন অঙ্গ ছেদন করা,) (২) ভেদ্যক্রিয়া (কোন স্থান

ভেদ করা), (৩) লেখ্যক্রিয়া (কোন স্থানের চর্ম্ম উত্তোলন করা), (৪) বেধ্যক্রিয়া (দূষিত রক্তাদি বাহির করিয়া দিবার জন্য শিরাদি ভেদ করা), (৫) এষ্যক্রিয়া (নালীঘা, বাঘী প্রভৃতি রোগে ক্ষতাদির পরিমাণ অন্বেষণ করা, (৬) আহার্য্যক্রিয়া (অশ্মরী প্রভৃতি রোগোদ্ভূত দ্রব্যাদি বাহির করা), (৭) বিস্রাব্যক্রিয়া (স্রাব উৎপাদন করা), ও (৮) সীবন (সেলাই করা)। চিকিৎসককে অস্ত্রক্রিয়াদি কর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই চলিবে না, অস্ত্রাদির দ্বারা প্রকৃতরূপে ছেদনাদি অস্ত্রক্রিয়া বহুদিবস ধরিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। কিরূপ কৌতূহলোদ্দীপক উপায়ে গুরু শিষ্যকে বিবিধ অস্ত্রক্রিয়া শিক্ষা দিতেন, তাহার আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।--

১। ছেদ্যক্রিয়া (incision)—কুমড়া, লাউ প্রভৃতি দ্রব্যকে ছেদন করিয়া অঙ্গচ্ছেদনাদির প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে।

২। ভেদ্যক্রিয়া (puncturing)—চামড়ার থলি, মৃত পশুর প্রস্রাবের থলি বা চামড়ার থলির মধ্যে জল ও কর্দ্দম পুরিয়া তাহা ভেদ করিয়া ভেদ্যক্রিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

৩। লেখ্যক্রিয়া (scratching)—মৃত পশুর লোমযুক্ত চর্ম্ম আঁচড়াইয়া শিক্ষা করিবে।

৪। এষ্যক্রিয়া (probing)—ঘুণধরা বাঁশ বা কাষ্ঠ, অথবা শুষ্ক লাউর মুখে অস্ত্র প্রবেশ করাইয়া এষ্যক্রিয়া শিক্ষা করিবে।

৫। আহার্য্য (extraction)—কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের মজ্জা এবং মৃত পশুর দন্তে যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া এই ক্রিয়া শিক্ষা করিবে।

৬। বিস্রাব্যক্রিয়া (evacuating fliuds)—মোমের দ্বারা পূর্ণ একখানি সিমুল কাষ্ঠে যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া রক্তপূজাদি স্রাব করিবার প্রণালী শিক্ষা করিবে।

৭। সীব্যক্রিয়া (sewing)—বস্ত্র বা নরম চর্ম্ম সূচী দ্বারা সেলাই করিয়া সীব্যক্রিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

৮। বেধ্যক্রিয়া (boring)—মৃত পশুর শিরা বা পদ্মের ডাঁটা বিঁধিয়া বেধ্যক্রিয়া শিক্ষণীয়।

৯। বন্ধনকার্য্য (bandage)—বস্ত্রাদির দ্বারা নির্ম্মিত পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বন্ধন করিয়া বন্ধনকার্য্য শিক্ষা করিবে। কোমল মাংসপেশী বা পদ্মের ডাঁটা বন্ধন করিয়া সন্ধিবন্ধন শিক্ষা করিবে।

১০। ক্ষার ও অগ্নিকার্য্য (cautery by caustics and fire)—মৃত পশুর কোমল মাংসখণ্ডের উপর ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

১১। বস্তিকার্য্য (catheterisation)—জলপূর্ণ কলসীর প্রান্তভাগ ছিদ্র করিয়া তাহার স্রোতে এবং লাউর মুখদেশে বা সেইরূপ অপর দ্রব্যে পিচকারী প্রয়োগ করিয়া বস্তিক্রিয়া শিক্ষণীয়

এইরূপে অস্ত্রক্রিয়া সম্যকরূপে শিক্ষা করিবার পর চিকিৎসা-কার্য্যে অভ্যাস ও দক্ষতালাভ করিলে চিকিৎসক চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে চিকিৎসক তৎকর্ম্মোপযোগী যন্ত্র, অস্ত্র, তুলা, বস্ত্রখণ্ড, সূত্র, পাখা, শীতল ও উষ্ণজল প্রভৃতি দ্রব্য ও উপযুক্ত সবল পরিচারক সংগ্রহ করিবেন। মূঢ়গর্ভ, উদর, অর্শঃ, অশ্মরী, ভগন্দর ও মুখরোগে অস্ত্র করিতে হইলে রোগীর আহারের পূর্ব্বে অস্ত্র ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে। চিকিৎসক বিশেষ সতর্কতার সহিত অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন, যেন সূক্ষ্ম শিরা ও স্নায়ু কাটিয়া না যায়। অস্ত্র করিবার পর অঙ্গুলির দ্বারা পূযরক্ত বাহির করিয়া দিয়া নিমপাতাদি কষায় দ্রব্যের জলে বেশ করিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিবেন। পরে তিল বাটা, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পলিতা বা বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া উহা ক্ষতমধ্যে পুরিয়া দিবেন ও তদুপরে মসিনার পুলটিশাদি দিয়া তিন চারি পর্দ্দা কাপড়ের দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিবেন। তিন

দিবস অতিবাহিত হইলে ক্ষতের বন্ধন খুলিয়া পুনরায় নিমপাতাদি কষায়জলে ধৌত করিয়া ঔষধাদি দিয়া পুনরায় বাঁধিয়া দিবেন। এইরূপে যতদিবস ক্ষত বেশ শুকাইয়া না যায় ততদিবস ধৌত করিয়া ঔষধ ও মলম লাগাইয়া দিবেন।

যন্ত্রের চিত্র
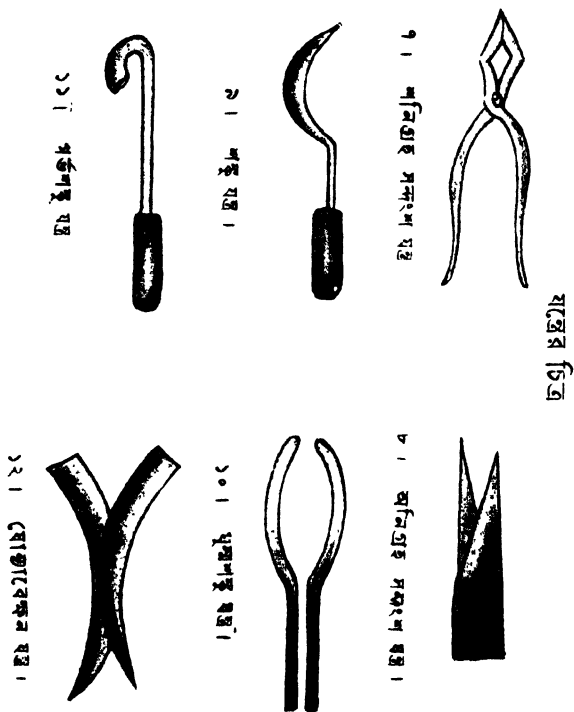
২। যন্ত্র

অস্ত্র প্রয়োগকল্পে সুশ্রুত ১২৫ প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সেগুলি আবার তুই ভাগে বিভক্ত—যন্ত্র ও শস্ত্র। যন্ত্র সর্ব্বসমেত ১০১টি, ও শস্ত্র ২৪ প্রকার। যন্ত্রের মধ্যে হস্তই প্রধানতম যন্ত্র, কারণ হস্ত ভিন্ন কোন যন্ত্রই প্রয়োগ করা যায়

না। যন্ত্রগুলি আবার ছয় ভাগে বিভক্ত—(১) স্বস্তিক যন্ত্র (চব্বিশ প্রকার) (২) সন্দংশ যন্ত্র (দুই প্রকার), (৩) তাল যন্ত্র (দুই প্রকার), (৪) নাড়ী যন্ত্র (বিংশতি প্রকার), (৫) শলাকা যন্ত্র (আটাইশ প্রকার), ও (৬) উপযন্ত্র (পঁচিশ প্রকার)। এই সকল যন্ত্র লৌহ বা স্বর্ণাদি পাঁচটি ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত হইত। আবশ্যকমত অন্যপ্রকার যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাও সুশ্রুত দিয়া গিয়াছেন।

১। স্বস্তিক যন্ত্র—অষ্টাদশ অঙ্গুলী দীর্ঘ এবং দুই খণ্ড লৌহ একটি খিল দ্বারা আবদ্ধ। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ প্রভৃতি দশ প্রকার পশুর ও কাক, চিল, শকুনি প্রভৃতি চতুর্দ্দশ প্রকার পক্ষীর, সর্ব্বসমেত চব্বিশ প্রকার জন্তুর মুখের সাদৃশ্যে চব্বিশ প্রকার স্বস্তিক যন্ত্র নির্ম্মিত হইত। হাড়ের মধ্যে বাণ বা কোন প্রকার শল্য বিদ্ধ হইলে উহা বাহির করিবার জন্য স্বস্তিক যন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

২। সন্দংশ যন্ত্র—ষোল অঙ্গুলি দীর্ঘ। এক প্রকার সন্দংশ যন্ত্র কর্ম্মকারের সাঁড়াশীর মত ও অপরটী ক্ষৌরকারের সন্নার মত। চর্ম্ম, মাংস, শিরা ও স্নায়ু হইতে ক্ষুদ্র শল্য বা কণ্টক বাহির করিবার জন্য সন্দংশ যন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

৩। তাল যন্ত্র—বার অঙ্গুলি দীর্ঘ। কর্ণ নাসিকাদির ভিতর হইতে মলাদি বাহির করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

৪। নাড়ী যন্ত্র—নানা আকারে নির্ম্মিত ও নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। অর্শোযন্ত্র, অঙ্গুলিত্রাণ যন্ত্র প্রভৃতি নাড়ীযন্ত্রের রূপান্তর।

৫। শলাকা যন্ত্র—আটাইশ প্রকার—শলাকা যন্ত্র বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া নানা আকারে নির্ম্মিত হইত।

এই সকল যন্ত্রের মধ্যে কয়েকটির চিত্র উপরে প্রদত্ত হইল।*

---

* যন্ত্র ও শস্ত্রের চিত্রগুলি প্রধানতঃ গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব কৃত "A Short History of Aryan Medical Science" নামক গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট চিত্র দৃষ্টে অঙ্কিত হইয়াছে।

৩। শস্ত্র বা অস্ত্র

সুশ্রুত শস্ত্র বা অস্ত্র বিংশতি প্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—(১) মণ্ডলাগ্র, (২) করপত্র, (৩) বৃদ্ধি, (৪) নখশস্ত্র, (৫) মুদ্রিকা, (৬) উৎপলপত্র, (৭) অর্দ্ধধার, (৮) সূচী, (৯) কুশপত্র, (১০) আটীমুখ, (১১) শারীরমুখ, (১২) অন্তর্মুখ, (১৩) ত্রিকূর্চ্চক, (১৪) কুঠারিকা, (১৫) ব্রীহিমুখ, (১৬) আরা, (১৭) বেতসপত্রক, (১৮) বড়িশা, (১৯) দন্তশঙ্কু, (২০) এষণী।

এই সকল অস্ত্র ছেদ্যক্রিয়া, ভেদ্যক্রিয়া, এষণক্রিয়া, সীবন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত অষ্ট প্রকার অস্ত্রপ্রয়োগক্রিয়ায় প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত হইত। এই সকল অস্ত্র উৎকৃষ্ট লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত, তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট, উত্তম রূপে ধরিবার উপায়বিশিষ্ট ও দন্তবিহীন হওয়া আবশ্যক। অস্ত্র সকলের ধার যন্ত্রভেদে মসূরকলায়ের ন্যায় স্থূল হইতে অর্দ্ধচুল প্রমাণ সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক। অস্ত্রের ধার সমান রাখিবার জন্য অস্ত্র শিমূলকাষ্ঠের খাপে রক্ষিত হইত এবং অস্ত্রে শান দিবার জন্য মাষকলাইয়ের রংবিশিষ্ট প্রস্তর ব্যবহৃত হইত। কয়েক প্রকার অস্ত্রের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কিরূপ দুরূহ অস্ত্রচিকিৎসার উপদেশ সুশ্রুত দিয়া গিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্থলে আমরা গর্ভস্থিত মৃতসন্তান ছেদন করিয়া বাহির করিবার প্রক্রিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "গর্ভস্থ মৃতসন্তান হস্ত সাহায্যে বাহির করিতে না পারিলে অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু সন্তান যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে কদাচ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে নাই, কারণ তাহাতে গর্ভিণী ও

সন্তান উভয়েরই মৃত্যু হইয়া থাকে। গর্ভস্থ মৃতসন্তান বাহির করিতে হইলে, গর্ভিণীকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক মণ্ডলাগ্র বা অঙ্গুলি শস্ত্র দ্বারা প্রথমতঃ গর্ভের মস্তক বিদীর্ণ করিবে, এবং শঙ্কু (আকর্ষণী) অস্ত্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড খর্পরগুলি বাহির করিয়া, পরে বক্ষ ও কক্ষদেশ ধরিয়া নিষ্কাসিত করিবে। যদি মস্তক

শস্ত্রের চিত্র
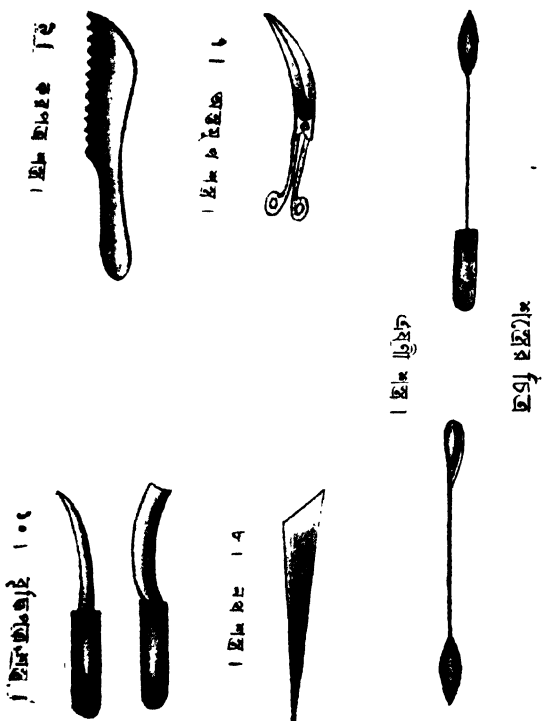
বিদীর্ণ করিতে না পারা যায় তাহা হইলে অক্ষিপুট বা গণ্ডদেশ ধরিয়া বাহির করিতে হয়। গর্ভস্থ সন্তানের স্কন্ধদেশ অপত্যপথে আবদ্ধ হইলে, সেই স্কন্ধসংলগ্ন বাহু ছেদন করিতে হইবে। গর্ভস্থ বালকের উদর, দৃতি অর্থাৎ ভিস্তীর ন্যায় বায়ুপূর্ণ থাকিলে, তাহা চিরিয়া অন্ত্রসমূহ আগে বাহির করিবে। ইহাতে গর্ভস্থ দেহ শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন অনায়াসেই বাহির করিতে

পারা যায়। জঘনদেশ দ্বারা অপত্যপথ অবরুদ্ধ হইলে, জঘনদেশের অস্থিখণ্ডসকল ছেদন করিয়া নিষ্কাসিত করিবে। মৃতগর্ভ ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইলে, মণ্ডলাগ্র নামক অস্ত্রই প্রয়োগ করা উচিত; উহাতে তীক্ষ্ণাগ্র বৃদ্ধিপত্র অস্ত্র প্রয়োগ করিতে নাই; করিলে গর্ভিণীকে আঘাত লাগিতে পারে।" হায়! অধুনা আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীগণের নিকট গর্ভস্থ মৃতসন্তানের ছেদনের কল্পনাও আকাশকুসুমরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, এমন কি তাঁহারা মণ্ডলাগ্র বা অন্য প্রকার অস্ত্র কখনও স্বচক্ষে দেখেন নাই! এমন দিন কি আসিবে না যখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় আবার উন্নত অস্ত্রচিকিৎসা স্বকীয় উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে?

(৪) বন্ধন।

সুশ্রুতে অনেকপ্রকার বন্ধনের (bandage) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পতন বা কোনপ্রকার আঘাতের দ্বারা দেহের অস্থিসমূহ ভগ্ন হইলে বা অস্ত্রপ্রয়োগের পর আহত বা ক্ষতস্থানে স্থানবিশেষে বিবিধ প্রকার বন্ধনের প্রয়োগ ছিল। বন্ধনপ্রণালী চতুর্দ্দশ প্রকার—(১) কোশ, (২) দাম, (৩) স্বস্তিক, (৪) অনুবেল্লিত, (৫) ছতোলী, (৬) মণ্ডল, (৭) স্থগিকা, (৮)যজক, (৯) খট্টা, (১০) চীন, (১১) বিবন্ধ, (১২) বিতান,*(১৩) গোফণা-ও (১৪) পঞ্চাঙ্গী। এই প্রবন্ধে তিন প্রকার বন্ধনের চিত্র প্রদত্ত হইল। বন্ধনকার্য্যে সূতার কাপড়, মেষলোমনির্ম্মিত বস্ত্র, রেশমী কাপড়, চর্ম্ম, বংশাদির চটা, সূতা, লৌহ, কাষ্ঠফলক প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ ব্যবহৃত হইত। যে প্রকার বন্ধন শরীরের

স্থানবিশেষে সুনির্দিষ্ট হয় সেই স্থানে সেই প্রকার বন্ধন প্রযোজ্য। স্থানবিশেষে বন্ধন তিন প্রকার—গাঢ়বন্ধন, সমবন্ধন ও শিথিল-বন্ধন। যে বন্ধন বেশ শক্ত অথচ যাহাতে বেদনা বোধ হয় না তাহা গাঢ়বন্ধন; যে বন্ধন ভিতরে ফাঁপা তাহা শিথিলবন্ধন ও যাহা খুব শক্তও নহে, শিথিলও নহে তাহাই সমবন্ধন।

গোফণা বন্ধন

পঞ্চাঙ্গী বন্ধন

ক্ষার।

রাসায়নিকের পক্ষেও সুশ্রুত পরম আদরের সামগ্রী। সুশ্রুতের মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণ ক্ষার প্রস্তুতপ্রণালী রসায়নের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চরক ও সুশ্রুত উভয়েই সর্জ্জীকাক্ষার (carbonate of soda) এবং যবক্ষার (carbonate of potash) দুইটি পৃথক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপে এই দুইটি ক্ষার বহুদিবস পর্য্যন্ত একই পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল।

সুশ্রুত ক্ষারকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—মৃদু (mild), মধ্য(caustic) ও তীক্ষ্ণ। সুশ্রুত তীক্ষ্ণক্ষার বলিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ভিন্নপ্রকারের ক্ষার পদার্থ নহে, তাহা মৃদুক্ষারে

স্বস্তিক বন্ধন
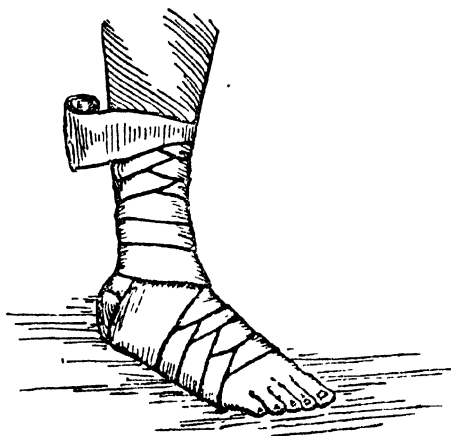
দন্তী, দ্রাবন্তী প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য মিশ্রিত আছে। আমরা মধ্য ক্ষারকেই তীক্ষ্ণক্ষার অর্থাৎ caustic alkali বলিয়া ধরিয়া লইলাম, কারণ "মধ্য" শব্দ ঠিক (caustic) শব্দের দ্যোতক নহে।

তীক্ষ্ণক্ষার—তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত প্রণালী আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। ঘণ্টাপারুল, কুটজ প্রভৃতি বৃক্ষের ক্ষারাত্মক ভস্ম জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে ভস্মশর্করা, ঝিনুক, শঙ্খনাভি অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া যে চুণ (caustic lime) পাওয়া যায় তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া চুল্লীতে পাক করিবে। মৃদুক্ষার ও

চূণ একত্রে জ্বাল দিয়া এখনও তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণক্ষার লৌহকলসীর মধ্যে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। তীক্ষ্ণক্ষার হীনবীর্য্য (carbonated) হইয়া যাইলে পুনরায় চূণের সহিত জ্বাল দিবার ব্যবস্থা আছে। সুশ্রুত ক্ষারের গুণ সঠিক ভাবেই দিয়াছেন—ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ও পিচ্ছিল (soapy)।

তেজপ্রশমন। (neutralisation)—অম্লরসের (acids) দ্বারা তীক্ষ্ণক্ষারের যে তেজপ্রশমন হয়, তাহাও সুশ্রুতের সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সুশ্রুত ইহার কারণ বলিয়াছেন যে ক্ষার দ্রব্যে লবণরস আছে, সেই জন্য অম্লরসের সহিত লবণরস সংযুক্ত হওয়াতে মাধুর্য্যগুণ প্রাপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণতাবিহীন হইয়া থাকে। আধুনিক রসায়ন সপ্রমাণ করিয়াছে যে অম্ল ও ক্ষার সংযুক্ত হইয়া একপ্রকার নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে লবণ (salt) বলে। এই লবণজাতীয় পদার্থে অম্ল বা ক্ষারের গুণ না থাকাতে অম্ল ও ক্ষার সংযোগে তীক্ষ্ণতা দূরীভূত হয়।

কায়চিকিৎসা।

সুশ্রুতে অস্ত্রচিকিৎসা ছাড়া কায়চিকিৎসারও অনেক উপদেশ আছে। চরক পাঁচ শত ভেষজের উল্লেখ করিয়াছেন। সুশ্রুত সাঁইত্রিশ গণে প্রায় ৭৬০টি ভেষজের গুণবর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সুশ্রুতে বিবিধ লবণ, ছয় ধাতু ও বিবিধ খনিজ পদার্থ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হে ঋষি! শুনিয়াছি তুমি সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলে। কিন্তু তুমি এ মরজগতে চিরকালই অমর

হইয়া রহিয়াছ—তোমার রচিত সংহিতা চিরকালই তোমায় অমর করিয়া রাখিবে। তুমি যে অসামান্য অস্ত্রচিকিৎসার উপদেশ জগৎকে দিয়া গিয়াছিলে, আমরা ভারতবাসী হইয়াও তাহার সম্যক সমাদর করিতে পারি নাই, তোমার উপদিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র স্বচক্ষে কখন দেখিতেও পাইলাম না। * আশীর্ব্বাদ কর—ভারতের অতীত গৌরবের, অতীত জ্ঞানগরিমার, অতীত স্বাধীনচিন্তার নিদর্শনস্বরূপ তোমার সংহিতার গৌরব করিবার অধিকার যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।

* আয়ুর্ব্বেদে পুনরায় অস্ত্রচিকিৎসার প্রচলনকল্পে ১৯১২ সালে জুন মাসে গ্রন্থকার সুশ্রুতোক্ত বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র ও শস্ত্র সকলের দুই সেট করিয়া নমুনা প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পরিষদ বিশেষজ্ঞের দ্বারা গঠিত একটি শাখাসমিতি নিযুক্ত করেন। গ্রন্থকার পুনরায় এই বিষয়টি ১৯১৩ সালের দিনাজপুরের উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে "আয়ুর্ব্বেদোক্ত শস্ত্র-নির্ম্মাণ" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করেন। গ্রন্থকার আশা করেন যে পরিষদের শাখাসমিতির কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে, তাঁহাদের কার্য্য আয়ুর্ব্বেদে অস্ত্রচিকিৎসার পুনপ্রতিষ্ঠাকল্পে কথঞ্চিৎ সহায়তা করিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গেলিলিও।

ভারতে যত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে—এমন বোধ হয় আর কোনও দেশে নাই। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পার্থক্য ও বিবাদ পুরাণাদি পাঠে বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এককালে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষে ভারতে ঘোরতর ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সম্প্রদায়পীড়িত ভারতে ইউরোপের লোমহর্ষণ ধর্ম্মবিপ্লবের সাদৃশ্য মিলিবে না। মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যে ধর্ম্মের নামে নরকের যে দৃশ্য অভিনীত হইয়াছিল তাহার স্মৃতি এখনও সভ্যসমাজকে লজ্জা দিতেছে। ধর্ম্মের নামে, ভগবানের নামে শত শত নরনারীকে জীবন্ত অবস্থায় প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে নৃশংসভাবে হত্যা করিতে বিপক্ষপক্ষীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, চিরশান্তশীতল বিজ্ঞানতরুচ্ছায়াশ্রিত সুধী ব্যক্তিকেও মধ্যযুগের ইউরোপ নিপীড়িত করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে কোপার্ণিকাস প্রচার করিলেন যে পৃথিবী সচলা, সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন সূর্য্যের গতির নির্দ্দেশক নহে, পরন্তু পৃথিবীর ভ্রমণ জন্য সংঘটিত হইয়া থাকে তাঁহার পূর্ব্বে সকলের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীই জগতের কেন্দ্রস্থল, এবং সূর্য্য

ও নক্ষত্রবর্গ পৃথিবীর চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। কোপার্ণিকাসের মত বাইবেলের মতের বিরোধী। পিতৃপুরুষগণের পুণ্যের বলে তাঁহাকে বিশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মতাবলম্বী অনেকেই সত্যের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত জ্যোতিষী টাইকো ব্রাহি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, ব্রুনোকে রোমনগরীতে ছয় বৎসর কারারুদ্ধ করার পর ১৬০০ খৃষ্টাব্দে জ্বলন্ত অগ্নিতে পুড়াইয়া মারা হইয়াছিল। বিচিত্র রামধনুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকর্ত্তা এণ্টোনিও ডমিনিসের কারাগারে মৃত্যু হওয়াতে জ্বলন্ত অগ্নির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় নাই। এই প্রবন্ধে যে মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হইবে তিনিও রোমের ধর্ম্মধ্যক্ষগণের নিকট অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া শেষে মৃত্যুর চিরশীতল অঙ্কে বিশ্রামলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অপরাধ ছিল এই যে, ইঁহারা যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছিলেন তাহাই লোকসমাজে নির্ভয়ে প্রচার করিয়াছিলেন। এখন বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বালক পৃথিবীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবে যে ইহা প্রচার করিতে গিয়া কাহাকেও কারাগারে অবরুদ্ধ থাকিতে হইয়াছে, কাহাকেও দস্যুতস্করের ন্যায় দেশ হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছে, এমন কি কাহাকে কাহাকেও জ্বলন্ত অনলে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষে পৃথিবীর সচলতা কোপার্ণিকাসের বহুপূর্ব্বে আর্য্যভট্টের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। উহা বেদ পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী ছিল না এমন নহে। কিন্তু ভারতের চিরউদার ধর্ম্মভাব কখনও বিজ্ঞানের সেবককে উৎপীড়ন করে নাই। যে সকল মহাপুরুষ

বিজ্ঞানের সেবায় লাঞ্ছনার বন্ধন জয়মাল্য বলিয়া নতশিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন মহাত্মা গেলিলিও তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান। শেষবয়সে তিনি একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু যৌবনে ও প্রৌঢ়ে তাঁহার উজ্জ্বল নয়নজ্যোতি নৈশগগণের অতুল সৌন্দর্য্যের ভিতর বিশ্বজগতের কত গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিল এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

গেলিলিও গেলিলি (Galileo Galilei) ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ইটালীর অন্তঃপাতী পিসানগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভিন্‌সেনজো উচ্চকুলোদ্ভূত কিন্তু দরিদ্র ছিলেন; অঙ্কশাস্ত্রে ও সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার প্রবল অনুরক্তি ছিল। গেলিলিও এই দুইটি বিদ্যায় আসক্তি পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকালেই গেলিলিওর বিজ্ঞানের প্রতি আসক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। বালক গেলিলিওকে এটা সেটা, ছোট ছোট খেলানা, যন্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সর্ব্বদাই দেখা যাইত। পুত্রের এইরূপ বিজ্ঞানাসক্তি দেখিয়া পিতা কিঞ্চিৎ ভীত হইতে লাগিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে, অঙ্কশাস্ত্রের বা বিজ্ঞানের সেবা করিলে অন্নসংস্থান হওয়া বড়ই সুকঠিন হইবে। তাঁহার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপকের বাৎসরিক মাহিনা ছিল ২০০০ স্কুডি (প্রায় ৬৫০০৲ টাকা), আর অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকের মাহিনা মাত্র ৬০ স্কুডি বা ২১৫৲ টাকা, অর্থাৎ মাসিক ২০৲ টাকারও কম। সেইজন্য তিনি গেলিলিওকে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য স্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন।

কিন্তু গেলিলিও বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র ছাড়িতে পারিলেন না। পিতার অজ্ঞাতসারে অসটিলিও রিসি (Ostillio Ricci) নামক

একজন বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদের নিকট ইউক্লিডের জ্যামিতি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি ইউক্লিড শেষ করিয়া আর্কিমিডিসের গ্রন্থ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে এই সংবাদ পিতার নিকট পঁহুছিলে, তিনি পুত্রের বিজ্ঞানের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ দেখিয়া অগত্যা পুত্রের মতেই মত দিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়া বালক গেলিলিও অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা আন্তরিক অনুরাগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই ঐ দুই শাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। শেষে তাঁহার পিতা যে ভয় করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল-- ছাব্বিশ বৎসর বয়সে গেলিলিও নির্দ্দিষ্ট ২০৲ টাকা মাসিক বেতনে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি "যাদৃশীর্ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। গেলিলিও পিতার ইচ্ছানুযায়ী চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে হয়ত কালে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক হইয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবীতে অর্থই কি জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবতা? তিনি দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়া যে অমূল্য সামগ্রী —অক্ষয় কীর্ত্তি—লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কুবেরের সমগ্র ভাণ্ডারের বিনিময়েও পাওয়া যায় না।

পেণ্ডুলামের নিয়ম আবিষ্কার।

পঠদ্দশাতেই গেলিলিওর মৌলিক গবেষণা আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই পেণ্ডুলামের গতির নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ক্লক ঘড়ির পেণ্ডুলাম সকলেই দেখিয়াছেন; এই পেণ্ডুলামের গতির উপর ঘড়ির ক্রিয়া নির্ভর

করিতেছে। গেলিলিও একদিন গির্জ্জায় আরাধনা করিতে গিয়াছেন, গির্জ্জার কড়িকাষ্ঠ হইতে যে বড় আলোকাধার ঝুলিতেছিল তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। আলো সবেমাত্র জ্বালা হইয়াছে এবং তখনও ল্যাম্পটা দুলিতেছিল। গেলিলিও এক হস্তের দ্বারা অপর হস্তের নাড়ীর স্পন্দন গুণিতে লাগিলেন এবং সেই সময়ে ল্যাম্পটা কত সময়ে একবার দোলে তাহাও দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি দেখিতে পাইলেন যে ল্যাম্পটা প্রথমে জোরে, ক্রমে আস্তে আস্তে দুলিতে লাগিল বটে, কিন্তু দেখা গেল, জোরেই হউক আর আস্তেই হউক ল্যাম্পটা ঠিক সমপরিমাণ সময়েই এক দিক হইতে অপর দিকে যাইতেছে। নাড়ীর স্পন্দন গুণিয়া তিনি সময় নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন। তিনি বাটী আসিয়া একগাছি দড়িতে একটা ভারী জিনিস বাঁধিয়া দোলাইতে লাগিলেন এবং গির্জ্জায় যাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা সপ্রমাণ করিলেন। এইরূপে পেণ্ডুলামের সমগতিত্ব (iscchronism) আবিষ্কৃত হইলে প্রথমে উহা ঘড়ির নির্ম্মাণকল্পে ব্যবহৃত হয় নাই, প্রথম প্রথম নাড়ীর স্পন্দনের গতি নির্ণয়কল্পে ব্যবহৃত হইত; পরে হিউজেন্স উহা ঘড়ির নির্ম্মাণকল্পে ব্যবহার করেন।

পতনশীল দ্রব্যের গতির নিয়ম আবিষ্কার।

আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, তাহার উত্তর বলুন ত। একটা দশসেরা আর একটা একসেরা ওজন লইয়া কলিকাতার মনুমেণ্টের উপর হইতে দুইটাকে এক সময়ে ছাড়িয়া দিলাম। বলুন দেখি কোনটা কোন সময়ে নীচে পঁহুছিবে। আপনি যদি গেলিলিওর জীবনবৃত্তান্ত পাঠ না করিয়া থাকেন তাহা

হইলে নিশ্চয়ই বলিবেন—কেন, দশসেরা ওজনটা একসেরা ওজনের দশগুণ আগে মাটিতে পড়িবে। গেলিলিওর আগে লোকে এইরূপই জানিত। বিখ্যাত প্রাচীন দার্শনিক এরিষ্টটলও (Aristotle) দশসেরা ওজন একসেরা ওজনের অপেক্ষা দশগুণ ভারী বলিয়া দশগুণ শীঘ্র মাটিতে পড়িবে তাহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। এরিষ্টটল অবশ্য পরীক্ষা করিয়া একথা লিখিয়া যান নাই, কিন্তু তিনি যখন এই কথা বলিয়া গিয়াছেন তখন তাহা অভ্রান্ত বেদবাক্য। গেলিলিও বলিলেন—না, তা হইতে পারে না; দুইটা ওজনই একসঙ্গে মাটিতে পড়িবে। তাৎকালিক বিজ্ঞপুরুষেরা তাঁহাকে পাগল বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাঁহার মতের জন্য তাঁহাকে বিবিধপ্রকারে উপহাস করিতে ত্রুটি করিলেন না। একদিবস তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় অধ্যাপকগণকে সঙ্গে লইয়া পিসার সুবিখ্যাত "লিনিং টাওয়ারে" (Leaning tower) উপস্থিত হইলেন। এই বৃহৎ স্তম্ভটি আটতালা উচ্চ ও একদিকে হেলিয়া আছে। তিনি একটি পঞ্চাশ সের আর একটি আধ সের ওজনের গোলা লইয়া এই স্তম্ভের উপরে উঠিলেন এবং উপরে গিয়া একই সময়ে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। সকলেই মনে করিয়াছিল যে গেলিলিও এই ব্যাপারে হাস্যাস্পদ হইয়া যাইবেন; কিন্তু যখন সকলে দেখিতে পাইলেন যে গোলা দুইটি একসঙ্গে ধমাস করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল তখন তাঁহারা নিজেরাই বোকা বনিয়া গেলেন। তাঁহারা স্পষ্ট দিবালোকে ব্যাপারটি স্বচক্ষে দেখিয়াও গেলিলিওর কথায় বিশ্বাস করিলেন না; নানারূপ বাক্যজালে তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণারই পোষকতা করিতে লাগিলেন। অন্ধবিশ্বাস প্রস্তরখণ্ডের ন্যায়ই

অচল ; জ্ঞানের খরস্রোতে না পড়িলে উহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া বড়ই দুষ্কর। একথা যেমন সমাজ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে সত্য, বিজ্ঞানসম্বন্ধেও যে অসত্য তাহা নহে।

দশ সের ও এক সের ওজনের দ্রব্য একসঙ্গে কেন মাটিতে পড়িয়া থাকে তাহা অতি সহজে পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। মনে করুন আপনি এক সের ওজনের এগারটি বল প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এই এগারটি বলকে একসঙ্গে একজায়গা হইতে ফেলিয়া দিলেন। অবশ্য সকলগুলিই একসঙ্গে মাটিতে পড়িবে। তাহার পর উহাদের দশটি একসঙ্গে জুড়িয়া দিলেন এবং এই জোড়া বল ও বাকি বলটিকে একসঙ্গে ছাড়িয়া দিলে উহারা একসঙ্গে পড়িবে না কেন? যে দশটি বলকে একসঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহাদিগকে এখন জোড়া হইয়াছে বলিয়া কি দশগুণ আগে পড়িবে? কখনই না। সেইরূপ একখণ্ড কাগজ ও একটা টাকা একসঙ্গে মাটিতে পড়িবে। তবে এক্ষেত্রে বাতাসের দরুণ কাগজখণ্ড বাতাসে উড়িতে থাকিবে। যদি বায়ুনিষ্কাশণ-যন্ত্রে (air pump) বায়ুকে নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে টাকাটি ও কাগজের টুকরা ঠিক একই সঙ্গে পড়িয়া যাইবে। বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্র এই পরীক্ষাটি কলেজে দেখিয়া থাকেন।

গেলিলিও পিসায় অবস্থানকালে পতনশীল দ্রব্যের (falling bodies) পতন সম্বন্ধে আরও অনেক গবেষণা করিতে লাগিলেন —ফলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু যতই তিনি নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে লাগিলেন, তাঁহার শত্রুবর্গ তাঁহার উপর ততই খড়্গহস্ত হইতে লাগিলেন। তিনি তিন

বৎসরের জন্য অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিন বৎসর শেষ হইতে না হইতে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, সংসারে একটি ভ্রাতা ও তিনটি ভগিনী। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল। সৌভাগ্যবশতঃ ভেনিসের মন্ত্রণাসভা তাঁহার সুনাম শুনিয়া ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। এখানে তিনি আঠার বৎসরকাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ের মধ্যে তিনি দূরবীক্ষণযন্ত্র (telescope) আবিষ্কার করিয়া তাহার সাহায্যে জ্যোতিষশাস্ত্রে এক নূতন যুগ আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার।

গেলিলিও পডুয়াতে মাত্র দুই বৎসর অধ্যাপকতা করিয়াছেন এমন সময়ে বিজ্ঞানজগতে একটি লোমহর্ষণ ঘটনার অভিনয় হইয়া গেল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে. ইউরোপে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে কোপার্ণিকাস প্রচার করিলেন—পৃথিবী সচলা ও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইতেছে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষীগণ এবং বাইবেল উপদেশ দিয়াছেন যে পৃথিবীই এই জগতের কেন্দ্রস্থল। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্তই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। কোপার্ণিকাস তাঁহার প্রণীত পুস্তক প্রকাশিত হইবার অল্পকাল মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেন, নচেৎ এই ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশের প্রতিকূল মতের আবিষ্কর্ত্তাকে নিশ্চয়ই নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর বিখ্যাত জ্যোতিষী টাইকো ব্রাহী তাঁহার মতের পোষকতা

করিতে গিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। টাইকো ব্রাহী, কেপলার ও গেলিলিওর সমসাময়িক গিওর্ডানো ব্রুনো (Giordano Bruno) নামক একজন তেজস্বী ইতালীবাসী সর্ব্বসমক্ষে কোপার্নিকাসের মত প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি স্পষ্টবক্তা লোক ছিলেন, ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। যখন তিনি বাইবেলের বিরোধী মত প্রচার করিতে নিষিদ্ধ হইলেন, তখন তিনি উত্তর করিলেন যে বাইবেল মানুষকে ভগবানকে ভালবাসিতে ও পবিত্রজীবন অতিবাহিত করিতে শিক্ষা দিবার জন্য লিখিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের রহস্য নির্দ্ধারণকল্পে রচিত হয় নাই।

রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানধর্ম্মের প্রধান পুরোহিত হইতেছেন রোমের পোপ। তখনকার দিনে ধর্ম্মদ্বেষীদের বিচারের জন্য "ইনকুইজিশন" (Inquisition) নামক এক বিচারালয় ছিল। এখানকার বিচারকগণ উচ্চপদস্থ ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। এই বিচারালয়ে ধর্ম্মদ্বেষী ব্রুনোর বিচার হয়। বিচারের ফলে তাঁহাকে ছয় বৎসর কারারুদ্ধ করা হয়। তখনও নির্ভীক চিত্তে নিজের মতের পোষকতা করাতে তাঁহাকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়।

গেলিলিও যৌবনকাল হইতে কোপার্ণিকাসের মতের পরিপোষক ছিলেন। সেইজন্য ব্রুনোর এই শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে তিনি নিজে যে বিচলিত হন নাই এমন বোধ হয় না। গেলিলিও বহুদিবস যাবৎ কোপার্ণিকাসের মত সমর্থন করিবার জন্য নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী কেপলারকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "আমি

প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনেকগুলি যুক্তি সংগৃহীত করিয়াছি, কিন্তু সেগুলি প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছি না; কারণ আমার ভয় হয় যে তাহা হইলে আমাদের গুরু কোপার্ণিকাসের দশাই আমাকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। যদিও তিনি কয়েকজনের নিকট অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ নির্ব্বোধ ব্যক্তির নিকটই উপহাস ও ঘৃণার পাত্র হইয়া রহিয়াছেন।”

কোপার্ণিকাসের মত কেবল বাইবেলের মতের বিরোধী বলিয়া সকলের নিকট উপহাস ও ঘৃণার সামগ্রী হইয়াছিল তাহা নহে। তাহার প্রধান কারণ মানব চরিত্রের এক প্রধান গূঢ় রহস্য। কোপার্ণিকাসের শত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এরিষ্টটল, টলেমে, হিপার্কাস প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকগণ ইহার বিপরীত শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ঋষিস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁহাদের মতের ভ্রান্তি কল্পনা করাও মহাপাপের কার্য্য। কোপার্ণিকাসের ও গেলিলিওর সমসাময়িক পণ্ডিতেরা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে বিজ্ঞানের লোকবিচার করিবার অবসর নাই। অমুকে বলিয়াছেন বলিয়া সত্য সত্য নহে, সত্য সত্য বলিয়াই সত্য। বাগভটের উক্তি—

ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্ত্বা চরকসুশ্রুতৌ।

ভেড়াদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদ্ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্॥

তাঁহাদের জানা থাকিলে এত অনর্থ ও রক্তপাত হইত না। “তস্মাৎ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্”—যাহা সুভাষিত তাহাই গ্রাহ্য। স্বাধীন চিন্তা, বিকাশ, বিস্তৃতি, বিজ্ঞানের প্রাণ। যদি পুরাতন ভ্রান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হয় তাহা হইলে উহাকে বিজ্ঞান সমূলে

উৎপাটিত করিবেই করিবে, উহার জন্মদাতা অমুক বলিয়া তাহার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিবে না। বিজ্ঞান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহার সেবকেরা সত্যের মহিমায় দীপ্ত হইয়া পৃথিবীর অত্যাচারকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকে। তাই দেখিতে পাই কোপার্ণিকাস, টাইকো, ব্রুনো, কেপ্‌লার, গেলিলিও লোকলজ্জা ও উপহাসকে ভয় না করিয়া অকুতোভয়ে বিজ্ঞানের মহিমা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

কিন্তু কোপার্ণিকাসের পর কত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কত অভিজ্ঞতা পৃথিবী অর্জ্জন করিয়াছে, এখনও কি এই প্রাচীনের প্রতি অহেতুকী ভক্তি গিয়াছে? সেদিন যখন চার্লস ডারউইন মানবের ক্রমবিবর্ত্তনের সংবাদ প্রচার করেন তখনও তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মদ্বেষী বলিতে অনেকে বিরত হন নাই। আমাদের দেশেও কত অসত্য প্রাচীনত্বের দাবী করিয়া অবাধে চলিয়া যাইতেছে। যদি কেহ বলেন যে, "স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ" সোণার পাথরবাটীর মত একটি অবাস্তব পদার্থ, তাহা হইলে তাঁহার উক্তি "তাণ্ডবনৃত্য" বলিয়া পরিচিত করিবার লোকের অভাব নাই। প্রাচীনের প্রতি সম্মান করিব, কিন্তু উহা প্রাচীন বলিয়াই অভ্রান্ত, একথা স্বীকার করিয়া লইব না—এই শিক্ষা আমরা কোপার্ণিকাস ও গেলিলিওর জীবনচরিত হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোপার্ণিকাসের মতের পোষকতা করিবার জন্য গেলিলিও প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। এতদিন কোপার্ণিকাসের মত অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে-ছিল। গেলিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া উহার চাক্ষুস প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দূরবীক্ষণের আবিষ্কার

একটু বিচিত্র। হলাণ্ড দেশে জ্যান্‌সেন ও লিপার্‌সে নামক দুই-জন চশমাবিক্রেতা বাস করিত। প্রবাদ এই যে জ্যান্‌সেনের ছেলেপিলেরা এক দিবস দুইখানা আতসী কাচ লইয়া খেলা করিতে করিতে দেখিতে পাইল যে, কাচ দুইখানা এক ভাবে ধরিলে সম্মুখের গির্জ্জার চূড়াটা খুব নিকটস্থ ও উল্টা দেখা যায়। তাহারা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া তাহাদের পিতাকে সংবাদ দিল। এই সংবাদ পাইয়া জ্যান্‌সেন ও লিপার্‌সে কাচ দুইখানি একখানি কাষ্ঠে বসাইয়া চশমার দোকানে নূতন খেলানা বলিয়া রাখিয়া দিল। একদিন মার্কুইস স্পিনোলা নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দোকানে গিয়া খেলানাটি ক্রয় করিয়া আনিয়া যুবরাজ মরিসকে দেখাইলেন। যাহা হউক এই চশমাবিক্রেতাদের খেলানার সংবাদ অস্পষ্টাকারে গেলিলিওর নিকট পঁহুছিয়াছিল। গেলিলিও এই সংবাদে এত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সমস্ত রাত্রি তিনি এই বিষয়ে ভাবিতে লাগিলেন। প্রাতে উঠিয়া আতসী কাচ লইয়া পরীক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিয়া ঠিক করিয়াছিলেন যে যখন এই খেলানায় দূরের গির্জ্জার চূড়া নিকটে দেখায়, তখন বহুদূরস্থিত আকাশের নক্ষত্রাবলী কি এই যন্ত্রের সাহায্যে নিকটস্থ দেখাইবে না? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আকাশমার্গের কত গূঢ় রহস্যই না প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, কত অজানিত জগৎ সম্মুখে দেখা যাইবে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহনক্ষত্রের কত নূতন অদ্ভুত সংবাদই না সংগৃহীত হইবে। এইরূপ ধারণা তাঁহাকে একেবারে চঞ্চল করিয়া ফেলিল। তিনি ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। তাহার নিকট অর্গান বাজাইবার একটা নল ছিল, অনেক চেষ্টার পর নলের একমুখে একখানি উন্নতোদর (convex) লেন্স ও আর

এক মুখে একখানি নতোদর (concave) লেন্স বসাইয়া, তাহার ভিতর দিয়া সোৎসুকনেত্রে চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। তিনি যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহাই পাইলেন। তাঁহার যন্ত্রে দূরের জিনিস খুব নিকটস্থ ও তিনগুণ বৃহৎ দেখাইতে লাগিল। উপরন্তু চশমা বিক্রেতার খেলানার ন্যায় ইহাতে পদার্থ সকল উল্টা না দেখাইয়া সবই সোজা দেখাইতেছিল। তখন তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। বাস্তবিক কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করার পর মনে কত আনন্দের উদয় হয়, ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ তাহা অনুভব করিতে পারে না। অনেক সময়ে অনেককে হাসিতে, নাচিতে, এমন কি আনন্দে ক্ষণিক অপ্রকৃতিস্থ হইতে শুনা যায়। আর্কিমিডিসের বিষয় কথিত আছে যে তিনি স্নানাগারে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ একটা কল্পিত বিষয়ের মীমাংসা মনে উদয় হওয়াতে তিনি এমনই দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া "আমি পাইয়াছি! আমি পাইয়াছি!" এই বলিতে বলিতে দৌড়াইয়া বাটী পঁহুছিয়াছিলেন।

গেলিলিও এই অদ্ভুত যন্ত্র লইয়া তাড়াতাড়ি ভেনিস নগরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে দেখাইয়া আশ্চর্যান্বিত করিতে লাগিলেন। প্রবীণ বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত যষ্টিতে ভর করিয়া উচ্চস্থানে উঠিয়া এই যন্ত্রের ভিতর দিয়া সুদূরস্থ জাহাজ সকল নিকটস্থ দেখিয়া আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে তাঁহার নাম ব্যক্ত হইয়া পড়িল। "বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে"—কিবা রাজদ্বারে, কিবা রাজবর্ত্মে সর্ব্বত্রই তিনি পূজা পাইলেন। কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার মাহিনা

দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার অধ্যাপকতা আজীবনস্থায়ী করিয়া দিলেন।

তাহার পর তিনি যাহাতে উহা অপেক্ষা কার্য্যকরী যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারেন তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, নিজেই লেন্স ঘসিয়া স্বহস্তে আর একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। এই যন্ত্রের দ্বারা এখন তিনি রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় সুনীল অম্বরের সৌন্দর্য্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রই গেলিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ক্রিয়া অবগত আছেন। সাধারণ পাঠককে দুই এক কথায় মোটামুটি অনেকটা বুঝাইয়া দেওয়া যায়। সাধারণ আতসী কাচ সকলেই দেখিয়াছেন—তাহা উন্নতোদর লেন্স। যদি আতসী কাচের দ্বারা সূর্য্যরশ্মি সংযত করা যায়, তাহা হইলে সূর্য্যের একটি ছোট গোল সাদা ছবি অপর দিকে পড়িয়া থাকে। উহা উল্টা। এই নিকটস্থ উল্টা ছবি আর একখানি উন্নতোদর লেন্সের ভিতর দিয়া দেখিলে উল্টা এবং বড় দেখায়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে একখানি উন্নতোদর ও একখানি নতোদর লেন্স ব্যবহৃত হওয়াতে সোজা ছবি পাওয়া গিয়াছিল। চশমাবিক্রেতা দুইখানিই উন্নতোদর লেন্স ব্যবহার করাতে ছবি উল্টা হইয়াছিল। আজ যে সকল বৃহৎ হইতে বৃহত্তর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহার্য্যে ভ্রমণশীল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর, অনন্ত সৌরজগতের, সৃষ্টিস্থিতিলয়সম্বন্ধে অশ্রুতপূর্ব্ব অচিন্তনীয় সংবাদ মানবের প্রত্যক্ষের মধ্যে আসিতেছে, সেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশ যে রত্নপ্রসূ তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

চন্দ্র

স্বভাবতই গেলিলিও চন্দ্রের প্রতি তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রথম ফিরাইলেন। হায় কবি! তুমিই বিজ্ঞানের প্রধান শত্রু। তুমি চন্দ্রকে ধরিয়া আনিয়া রমণীর সুন্দর মুখের সঙ্গে তুলনা
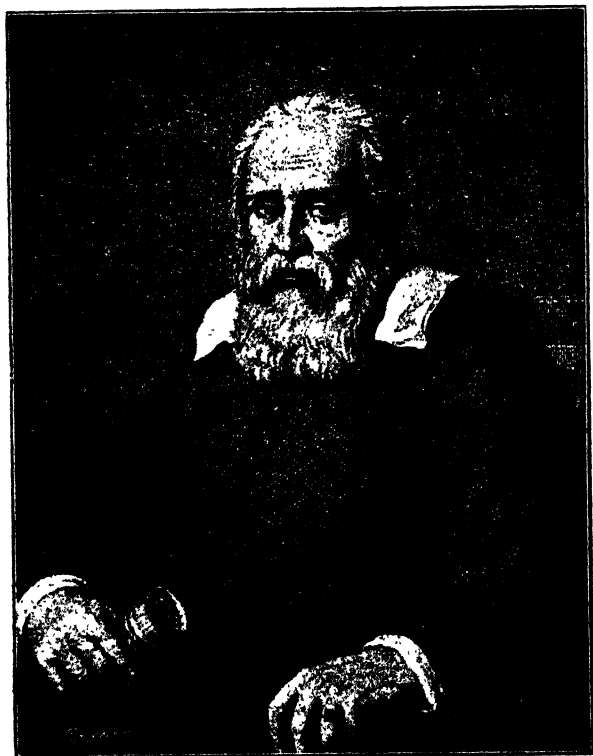
গেলিলিও

দিয়া থাক, তাহাতে আপত্তি করিব না (যদিও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নিটোল, চাকা থালার ন্যায় সুগোল, থ্যাব্‌ড়ানো বদন কয়জন পাঠক পছন্দ করিবেন তাহা আমি জানিতে চাহি); কিন্তু তুমি কবি, নেশার ঝোঁকে চন্দ্রের মধ্যস্থিত পর্ব্বত উপত্যকাকে শশীর কলঙ্ক, বুড়ির চরকা প্রভৃতি আজগুবি ব্যাপার বলিয়া কল্পনা করিয়া বিজ্ঞানের পথ একেবারে রোধ করিয়াছ। তুমি বিচিত্র রামধনুকে বাসবের বা রামের ব্যবহৃত ধনু বলিয়া লোকসমাজে প্রচার করিয়াছ। তুমি নক্ষত্রবর্গকে সুরসুন্দরী সাজাইয়া চন্দ্রকে রোহিণী প্রভৃতি সাতাইশ সুন্দরীর বহুপত্নীক স্বামী গড়িয়াছ। তোমারই বাক্য পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলিয়া অবাধে গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। এ ঘটনা শুধু ভারতেই ঘটিয়াছে তাহা নহে। সমগ্র আদিম মানবসমাজে এইরূপ কল্পনার অভাব দৃষ্ট হয় না। তাই যখন গেলিলিও তাঁহার যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলেন যে পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রেও পর্ব্বত, উপত্যকা, সমতলক্ষেত্র প্রভৃতি দ্রব্য বিদ্যমান রহিয়াছে তখন সে সংবাদ কেহই বিশ্বাস করিল না। তাহাও কি কখন হয়? ঐ স্বর্গীয়, শান্তশীতল, সুধাময় চন্দ্রবদন কখনও কি পাহাড় পর্ব্বতে পরিপূর্ণ হইতে পারে? তিনি আবার এই সকল পাহাড়ের উচ্চতাও মাপিয়াছিলেন—কোনও পর্ব্বত পাঁচ মাইল, কোনটি বা সাত মাইল উচ্চ। তাঁহার অপরাধের সংখ্যা এখনও শেষ হয় নাই—তিনি প্রচার করিলেন যে যেমন চন্দ্র সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া কিরণ বিতরণ করে, সেইরূপ পৃথিবীও কিরণ বিতরণ করিয়া থাকে। সকলেই তৃতীয়া চতুর্থীর চাঁদে দেখিয়া থাকিবেন যে, কাস্তের মত চাঁদের উজ্জ্বল কলার সঙ্গে চাঁদের

অপর অংশ অস্পষ্ট দেখা যায়। গেলিলিও বলিলেন এরূপ দেখা যাইবার কারণ আর কিছুই নহে—পৃথিবীর কিরণ চাঁদে পড়িয়া চাঁদে "পৃথিবীজ্যোৎস্নার" উদয় হইয়া থাকে। আমরা যেমন পৃথিবী হইতে চাঁদ দেখি, চাঁদে যদি কোনও জীব থাকিত তাহা হইলে তাহারাও সেইরূপ আলোকময় পৃথিবী দেখিত। কেবল পৃথিবী তাহাদের কাছে চন্দ্র অপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল ও প্রায় ষোলগুণ বড় দেখাইত।

গেলিলিওর এই সকল অদ্ভুত আবিষ্কারের সংবাদ তাৎকালিক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত পড়িল। জ্ঞানের বৃদ্ধির প্রয়োজন কি—যদি চন্দ্রকে এইরূপে স্বর্গের দেবতার আসন হইতে পদচ্যুত হইতে হয়! কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধবাদীরা বলিতেন যে পৃথিবী একটি গ্রহ হইতে পারে না, কারণ অন্যান্য গ্রহের ন্যায় উহার কিরণ নাই। গেলিলিও "পৃথিবীকিরণ" আবিষ্কার করাতে তাঁহাদের আর একটি অবলম্বন খসিয়া পড়িল।

গেলিলিও তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্র এখন নভোমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকেই নূতন নূতন তারকা আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। সুনীল নভোমণ্ডলের মেখলাস্বরূপ—"ছায়াপথ"—যাহা কবিকল্পনায় দেবতাদিগের স্বর্গের রাজবর্ত্ম বলিয়া কল্পিত হইয়া আসিয়াছে—গেলিলিওর যন্ত্রের সাহায্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকার সমষ্টি বলিয়া ধরা পড়িল। কোন কোনও তারকা চর্ম্মচক্ষে একটি বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে, গেলিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহাতে দুইটি তারকা দেখিতে পাইলেন।

বৃহস্পতির উপগ্রহ।

১৬১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি বৃহস্পতি গ্রহ (Jupiter) খুব মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৭ই জানুয়ারী তিনি উহার নিকটে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকা

বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ আবিষ্কার।

দেখিতে পাইলেন। উহার মধ্যে দুইটি তারকা বৃহস্পতির বামে ও অপরটি দক্ষিণে ছিল। পর রাত্রে দেখিতে পাইলেন যে

(১) ৭ই জানুয়ারী ১৬১০।
(২) ৮ই জানুয়ারী ১৬১০।
(৩) ৯ই জানুয়ারী ১৬১০।

তিনটি তারকাই উহার দক্ষিণে আসিয়াছে। ৯ই তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে সে রাত্রে আর কিছুই দেখা গেল না। ১০ই তারিখে গেলিলিও দেখিলেন যে সে রাত্রে দুইটি
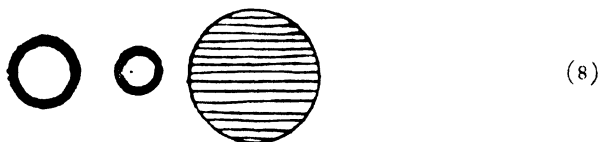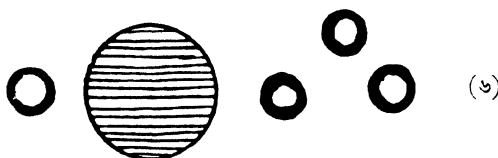
বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ আবিষ্কার।

তারকা ঘুটিয়াছে, দুইটিই গ্রহের বাম দিকে। ১১ই তারিখেও সেই দুইটি তারকা বৃহস্পতির বামেই আছে, তবে একটি একটু বড় দেখাইতেছিল। ১২ই তারিখে তিনটিই আবার ফিরিয়া

(৪) ১১ই জানুয়ারী ১৬১০।

(৫) ১২ই জানুয়ারী ১৬১০।

(৬) ১৩ই জানুয়ারী ১৬১০।

আসিয়াছে এবং ৭ই জানুয়ারীর মত দুইটি বামে ও একটি ডাহিনে আসিয়াছে। তাহার পর দিবস গেলিলিও ঐরূপ চারিটি তারকা দেখিতে পাইলেন। ঐরূপ চারিটির বেশী তারকা আর দেখা গেল না। গেলিলিও এখন প্রচার করিলেন যে যেমন পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্র ঘুরিতেছে, তেমনি বৃহস্পতি গ্রহের চারিদিকে চারিটি উপগ্রহ বা চন্দ্র ঘুরিতেছে। পৃথিবী যেমন একটি গ্রহ এবং উহার উপগ্রহ আছে, সেইরূপ বৃহস্পতিও আর একটি গ্রহ এবং উহার উপগ্রহ আছে। এই পরীক্ষামূলক তথ্যের সংবাদ রাষ্ট্র হইলে তাৎকালিক বিজ্ঞপুরুষগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাও কি কখন হয়?—অনেকেই অবিশ্বাস করিলেন। এ সংবাদ বিশ্বাস করিতে হইলে বাইবেলকে অমান্য করিতে হয়, প্রচলিত প্রাচীন মতকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। পৃথিবীই যে জগতের মূলধার,—কেমন করিয়া তাহারা বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীর ন্যায় অন্ততঃ আর একটি গ্রহ বর্ত্তমান আছে।

গেলিলিও সকলকে তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়া তাঁহার আবিষ্কৃত উপগ্রহগণের ভ্রমণ পরীক্ষা করিতে আহ্বান করিলেন। কেহ কেহ স্বচক্ষে দেখিয়াও বলিলেন যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে পৃথিবীর দ্রব্যসমূহ সঠিকরূপে দৃষ্ট হইলেও উহা আকাশমার্গের রহস্যভেদ করিতে সমর্থ নহে। অপর কেহ কেহ অবিশ্বাসী হইবার ভয়ে যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখিতে স্বীকৃত হইলেন না। এইরূপ এক ব্যক্তির শীঘ্র মৃত্যু হয়। গেলিলিও রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "আমি আশা করি তিনি স্বর্গে যাইবার পথে ঐগুলি দেখিয়া গিয়াছেন।"

শুক্রগ্রহের ক্ষয়বৃদ্ধি।

এই সকল অশ্রুতপূর্ব্ব আবিষ্কারের পর গেলিলিওর মনে এই সুন্দর অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর স্থিতি ও গতির রহস্য উৎঘাটন করিবার বাসনা ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকের অবিশ্বাস তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে সমর্থ হইল না। পরন্তু তাঁহার উৎসাহ দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল; তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও মানসিক বল তাঁহাকে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য সমধিক প্রোৎসাহিত করিতে লাগিল। তিনি শীঘ্রই আর একটি পরীক্ষামূলক আবিষ্কারের দ্বারা তাঁহার শত্রুবর্গের আশা ভরসা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিলেন। তিনি শুক্রগ্রহ (Venus) পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে উহা গোলাকার। একরাত্রে তিনি সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন যে উহা তৃতীয়া বা চতুর্থীর চাঁদের সরু কলার ন্যায় দেখা যাইতেছে। তাহার পর তিনি রাত্রির পর রাত্রি শুক্রগ্রহের পরিবর্ত্তন পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—ক্রমে ক্রমে উহা ফলকের আকৃতি হইতে সুগোল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পূরিয়া উঠিল। তখন তাঁহার আর আনন্দ ধরে না। ইহা হইতে অবিসম্বাদীরূপে সপ্রমাণিত হইতেছে যে শুক্র-গ্রহও পৃথিবীর সহিত সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে।

কোপার্ণিকাস পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছিলেন যে মানবের দৃষ্টিশক্তি যদি সম্যক বৰ্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ চন্দ্রের ন্যায় ক্ষয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে। গেলিলিও এই ভবিষ্যৎবাণী পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন। বিরুদ্ধবাদীরা এই নূতন প্রমাণের উপরে বিশ্বাস স্থাপনত

করিলেনই না, উপরন্তু গেলিলিওর উপর তাঁহাদের আক্রোশ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহারা দেখিলেন যে যদি গেলিলিওর মত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীকে অনন্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর মধ্যে একটা অতি ক্ষুদ্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বহুকাল হইতে তাঁহারা শিখিয়া আসিতেছেন যে পৃথিবীই জগতের কেন্দ্রস্থল, এই অগণ্য তারকামণ্ডলী রাত্রিতে পৃথিবীকে আলোক প্রদান করিবার জন্যই সৃজিত হইয়াছে। এত বড় মতের পরিবর্ত্তন কি সহজে হয়?

শনিবলয় (Saturn's ring)।

তাহার পর গেলিলিও শনিগ্রহের দিকে তাঁহার যন্ত্র ফিরাইলেন। তিনি শীঘ্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন যে এই গ্রহ একটি মাত্র তারকা নহে, উহার দুই পাশে আরও দুইটি ছোট ছোট তারকা আছে। পরে জানা গিয়াছে যে এই দুইটি পদার্থ
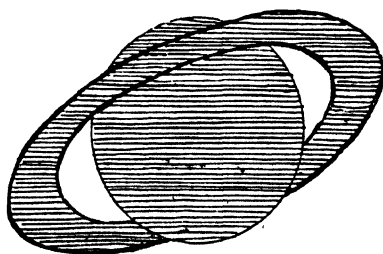
শনি বলয়

তারকা নহে, উহারা এই গ্রহের চারিদিকে যে গোলাকার বলয় (ring) আছে, তাহারই দুই প্রান্তভাগ মাত্র। গেলিলিওর

দূরবীণ যন্ত্র সমধিক উৎকৃষ্ট না হওয়াতে সমগ্র শনিবলয় গেলিলিওর দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী হিউজেন্স বৃহত্তর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ শনিবলয় আবিষ্কার করেন।

এই সমস্ত অশ্রুতপূর্ব্ব অচিন্তনীয় আবিষ্কার গেলিলিও প্রায় এক বৎসরের মধ্যে করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই এক বৎসরের
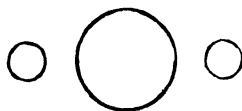
গেলিলিও কর্ত্তৃক দৃষ্ট শনিবলয়।

মধ্যে পরীক্ষামূলক জ্যোতিষের কিরূপ দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহা উপরোক্ত আবিষ্কারকাহিনী হইতে সম্যক উপলব্ধি হইবে। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের অবিশ্বাস সত্ত্বেও বহু ছাত্র তাঁহার শিষ্য হইলেন। ইউরোপে সর্ব্বত্র তাঁহার আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মিত হইতে লাগিল এবং বিভিন্ন দেশের জ্যোতিষী-বর্গ গেলিলিওর তাবৎ আবিষ্কার নিজ নিজ পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণিত করিতে লাগিলেন। প্রবল বন্যার স্রোত কি বালির বাঁধে রোধ করা যায়?

সূর্য্য কলঙ্ক (Sun-spots)।

তাহার পর বৎসর ১৬১১ খৃষ্টাব্দে গেলিলিও সূর্য্যের দিকে তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্র ফিরাইলেন। হায়! হায়! গেলিলিও করিলে কি? যে সূর্য্য কবিকল্পনায় দেবতার আসনে উপবিষ্ট,

যিনি সপ্তাশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া প্রভাতকালে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া প্রবল প্রতাপে রথনেমির গম্ভীর নির্ঘোষে নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বিচরণ করিতে করিতে সন্ধ্যাকালে স্বীয় আলয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন, যাঁহার পূজা, হোম, তপ অতি প্রাচীন যুগ হইতে এখনও পৃথিবীর নানাস্থানে প্রচলিত, তাঁহারই প্রতি তুমি ক্ষুদ্র মানব হইয়া তোমার যন্ত্র ফিরাইতে সাহসী হইলে? তোমার বিরুদ্ধবাদীরা তোমায় যদি একেবারে হত্যা করিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের নিতান্ত দয়াব শরীর বলিয়া আমরা তাঁহাদের প্রশংসাই করিব। গেলিলিও পরীক্ষা করিতে করিতে সূর্য্যের মধ্যে কতকগুলি দাগ বা কলঙ্ক (Sun-spots) দেখিতে পাইলেন। এই দাগগুলি সকল সময়ে একরূপ থাকে না, কখনও কখনও কতকগুলি মিলিয়া এক হইয়া যায়, কখনও কখনও একটাই ভাঙ্গিয়া অনেকগুলিতে পরিণত হয়। গেলিলিও কেবল এই দাগগুলি আবিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এই দাগগুলি ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া গিয়া পুনরায় আটাইশ দিবস পরে আবার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা তিনি সহজেই সপ্রমাণ করিলেন যে, আটাইশ দিনে সূর্য্য নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘুরিয়া আসে।

গেলিলিওর বিচার।

এতক্ষণ আমরা গেলিলিওর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী বিবৃত করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। এখন হইতে তাঁহার দুঃখপূর্ণ জীবনকাহিনীর পরিচয় দিয়া অশ্রুজলের

সহিত তাঁহার পূণ্যময় স্মৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে।

১৬১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আঠার বৎসর কাল তিনি পদুয়াতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐখানেই তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্র, চন্দ্রমণ্ডলে পর্ব্বতের অবস্থিতি ও বৃহস্পতিগ্রহের উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ক্রমে এই সকল গবেষণায় তাঁহার মস্তিষ্ক ও মন অহোরাত্র এত ব্যস্ত থাকিত যে, বিশ্ববিত্যালয়ে অনবরত ছাত্রদিগের বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার নিকট বিরক্তিজনক হইয়া উঠিল। এখন তিনি বিজ্ঞানের সেবায় সমস্ত সময় কিরূপে অতিবাহিত করিতে পারিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহারই শিষ্য ও বন্ধু টস্‌কানীর গ্র্যাণ্ডডিউক দ্বিতীয় কসমো (Cosmo II) তাঁহাকে স্বীয় রাজধানী ফ্লোরেন্সে যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। গেলিলিওর জন্মস্থান পিসানগরী ফ্লোরেন্সের অতি সন্নিকট এবং টস্‌কানীর অন্তর্গত; সুতরাং এই নিমন্ত্রণ তিনি সাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ফ্লরেন্সে প্রত্যাগমন তাঁহার পক্ষে যতই সুবিধাজনক হউক না কেন, পদুয়া নগরী পরিত্যাগ তাঁহার জীবনের প্রধান ভ্রমের কার্য্য হইয়াছিল, কারণ টস্‌কানী রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের একচ্ছত্র রাজা পোপের ক্ষমতার অধীন ছিল। অপর দিকে ভেনিস রাজ্য প্রজাতন্ত্রের দ্বারা শাসিত এবং পোপের ক্ষমতার বিরোধী ছিল। পদুয়া নগরী এই ভেনিস রাজ্যের অন্তর্গত থাকায় তিনি মাতৃক্রোড়ে শিশুর মত পোপের রোষাগ্নি হইতে নিরাপদ ছিলেন। পদুয়া পরিত্যাগের পর হইতেই তিনি পোপের ক্ষমতার অধীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধব কতই উপরোধ অনুরোধ করিলেন,

কিন্তু কিছুতেই তিনি পদুয়াতে থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না। "নিয়ত কেন বাধ্যতে" ?

প্রথম প্রথম ফ্লরেন্সে গিয়া গেলিলিও বেশ শান্তিতেই ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি ইউরোপের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, রাজদ্বারে তাঁহার সম্মানের সীমা ছিল না; আর্থিক সচ্ছলতাও বেশ ছিল। এখানে ছাত্রদিগের জন্য আর বক্তৃতা করিতে হইত না—তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই পাইলেন।

কিন্তু এই শান্তি প্রলয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার প্রকৃতির শান্তভাবের মতই হইল। ক্রমশঃ তাঁহার বিরোধীগণ তাঁহার মতের প্রতি পোপের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এখন গেলিলিওত আর পদুয়াতে নাই, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্নাদি রোম হইতে ফ্লোরেন্সে অনায়াসে আসিতে আরম্ভ করিল। তিনি যে স্বীয় মতের পোষকতা করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, এ কথা তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইল। অবশেষে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে পোপ পঞ্চম পল তাঁহাকে রোমনগরীতে গিয়া স্বয়ং তাঁহার মতাবলী পোপের গোচর করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তিনি রোমে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রাদিও সঙ্গে করিয়া লইলেন। রোমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার যন্ত্রাদি সাহায্যে সকলকে স্বকীয় আবিষ্কৃত গ্রহ উপগ্রহাদি প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। এক দিবস স্বয়ং পোপের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রায় এক ঘণ্টা যাবৎ কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহাকে তাঁহার আবিষ্কারগুলি বুঝাইয়া দিলেন। পোপ তাঁহার উপর কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। গেলিলিও মনে করিলেন

যে তাঁহার সৌভাগ্যরবি এইবার মেঘমুক্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি আরও কিছুকাল রোমে থাকিয়া সকলকে নিজের মত বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার বিপক্ষপক্ষীয় অনেক উচ্চপদস্থ ধর্ম্মযাজক ক্রমশঃ তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। এখন তাঁহারা কোপার্ণিকাসের মত বাইবেলবিরোধী কিনা এই মূল প্রশ্নেব মীমাংসার জন্য পোপকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। গেলিলিও এই প্রশ্নের মীমাংসার অপেক্ষায় রোমে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে তাঁহার অবস্থিতি ইঁহাদের কাছে অতি তিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল। তিনি স্বকীয় নূতন মতের দ্বারা এরূপ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, কোন পথ তাঁহার পক্ষে শ্রেয় তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে কোপার্ণিকাসের মত বাইবেলবিরোধী। কোপার্নিকাসের এবং কেপ্‌লারের গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রচারিত হইল। গেলিলিওর প্রতি আদেশ হইল যে তিনি আব কখনও পৃথিবীর সচলতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারিবেন না। গেলিলিও ভগ্নহৃদয়ে ফ্লোরেন্সে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আদৌ ধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন না, এবং তাঁহার মত বাইবেলের কোনও এক অংশের বিপরীত বলিয়া নিজে দুঃখিতও ছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যাহা সত্য বলিয়া জানিতেন তাহা পরিত্যাগ করেন কি করিয়া ?

সে যাহা হউক গেলিলিও রোম হইতে ফিরিয়া আসিয়া অনেকটা নিরুপদ্রবে কাল কাটাইতেছিলেন। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে পুরাতন পোপ স্বর্গারোহণ করেন এবং কার্ডিনাল বার্‌বেরিনো

নামক তাঁহারই একজন বন্ধু সপ্তম আর্ব্বান নামে পোপপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার বন্ধু বারবেরিনোকে পোপপদে অভিষিক্ত দেখিয়া গেলিলিও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন এবং তিনি এমনও আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে পুরাতন পোপের আদেশ প্রত্যাহৃত হইবে। তিনি স্বীয় বন্ধুর পদোন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য স্বয়ং রোমনগরীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নূতন পোপের সহিত কথাবার্ত্তায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে নূতন পোপের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া তিনি "টলেমী ও কোপার্ণিকাসের জ্যোতিষ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা" নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই পুস্তকে তিনি তিনজনের কথাবার্ত্তাচ্ছলে তাঁহার মতগুলি বেশ বিশদভাবে ব্যাখা করিয়াছেন। এক ব্যক্তি কোপার্ণিকাসের মতাবলম্বী, দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন বিদূষক এবং তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহার একজন বিরুদ্ধবাদী। এই গ্রন্থে বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত আপত্তিই তিনি খণ্ডন করিয়া দিয়াছিলেন। এই পুস্তক তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদিগের গুপ্ত রোষাগ্নি একেবারে প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল। তাঁহার বিরুদ্ধে যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা এখনও প্রত্যাহৃত হয় নাই, অথচ তিনি স্বকীয় মত পুনরায় নূতন ভাবে প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছেন। এবার তাঁহার আর নিস্তার রহিল না। তাঁহাকে রোমে যাইয়া বিচার গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ প্রেরিত হইল। তাঁহার বয়স তখন সত্তর হইয়াছিল। এই সপ্ততিপর বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিককে অব্যাহতি দিবার জন্য তাঁহার বন্ধুবর্গ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ফলে কিছুই হইল

না। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি রোমে পঁহুছিলেন। সেখানে পঁহুছিয়াই তিনি বাটীর বাহির হইতে নিষিদ্ধ হইলেন। জুন মাসে ইন্‌কুইজিশন নামক বিচারালয়ে তাঁহার রীতিমত বিচার আরম্ভ হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মদ্বেষীগণের জন্য যে বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাই ইন্‌কুইজিশন নামে অভিহিত হইত।

এখানকার বিচারপদ্ধতি স্থূলতঃ সাত ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম। অপরাধীকে বিচারালয়ে তাহার অপরাধ জ্ঞাত করান ও সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকৃত না হইলে তাহাকে নির্য্যাতনের (torture) ভয় প্রদর্শন করা।

দ্বিতীয়। নির্য্যাতন করিবার ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত অপরাধীকে লইয়া গিয়া পুনরায় নির্য্যাতনের ভয় প্রদর্শন করা।

তৃতীয়। ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া নির্য্যাতনোপযোগী যন্ত্রাদি প্রদর্শন করা।

চতুর্থ। বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলিয়া অপরাধীকে নির্য্যাতন যন্ত্রে বদ্ধ করা।

পঞ্চম। নির্য্যাতন ক্রিয়া।

এইরূপ নির্য্যাতন ক্রিয়ার পরেও যদি অপরাধী স্বীয় অপরাধ স্বীকার না করে ও অনুতপ্ত না হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত চরম দণ্ড তাহার জন্য বিধিবদ্ধ ছিল।

ষষ্ঠ। কয়েক বৎসর কারারুদ্ধ করা।

সপ্তম। অগ্নিতে জীবন্ত অবস্থায় পুড়াইয়া মারা।

২১এ জুন গেলিলিও এই ভয়াবহ বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং ২৪এ ঐ স্থান হইতে বাহির হইয়া আইসেন। এই বিচারের সময় জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিত এবং অপরাধীও সমস্ত বিষয় গোপন রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত। বিচারালয়ের খাতাপত্রও লোকচক্ষুর অগোচর। সেইজন্য এই তিন দিবস গেলিলিওকে প্রকৃত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল কি না তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। আশা করি বিচারকগণ এই পুণ্যশ্লোক বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধকে নির্য্যাতনের অনুজ্ঞা দিয়া নিজেদের রসনা কলঙ্কিত করেন নাই। এই সময় দারুণ দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর ও মন একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, উপরন্তু তাঁহার স্নেহময়ী কন্যা ক্রমাগত তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইতেছিলেন। নানা কারণে গেলিলিও আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বিচারকর্গণকে বলিলেন, "আপনারা আমায় যাহা বলিতে আজ্ঞা করিবেন আমি তাহাই বলিতে প্রস্তুত আছি।" তখন বিচার-পতিগণ তাঁহার প্রতি নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করিলেন।

প্রথম। গেলিলিও পৃথিবীর সচলতা সম্বন্ধে যে মত ও বিশ্বাস প্রচার করিয়া আসিয়াছেন তাহা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

দ্বিতীয়। যাবজ্জীবন কার্য্যত না হউক অন্তত নামত কারারুদ্ধ থাকিতে হইবে।

তৃতীয়। সাতটি অনুত্তাপসূচক প্রার্থনাসঙ্গীত প্রতি সপ্তাহ আবৃত্তি করিতে হইবে।

দশ জন কার্ডিনাল নামক উচ্চ উপাধিধারী ধর্ম্মযাজক

বিচারপতি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তিন জন বিচারালয়ের রায়েতে স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হন নাই। অবশিষ্ট সাত জনের কলঙ্কিত লেখনীর স্বাক্ষর এখনও এই দলিলের উপর দৃষ্ট হয়। গেলিলিও এইরূপে নিগৃহীত হইয়া বাইবেল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে বাধ্য হইলেন "ইহা আদৌ সত্য নহে যে সূর্য্য জগতের কেন্দ্র স্থল এবং পৃথিবী সচলা। আমি এত দিবস এ বিষয়ে যাহা বিশ্বাস ও ধারণা করিয়া আসিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ অসত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ভবিষ্যতে মৌখিক বা লিখিত ভাষায় কখনও এই অসত্য প্রচার করিব না।" অনেকেই বলিবেন যে গেলিলিওর এইরূপ মিথ্যা প্রতিজ্ঞায় স্বীয় রসনাকে কলঙ্কিত করা আদৌ উচিত ছিল না, বরং ব্রুনোর মত জলন্ত অগ্নিতে আত্মসমর্পণ করিয়া উৎপীড়িতের জয়মাল্য বরণ করিয়া লইলেই ভাল হইত। তাঁহাদিগের প্রতি অনুরোধ এই যে, তাঁহারা এই হতভাগ্য বৃদ্ধের বয়স এবং তাৎকালিক শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য বিবেচনা করিয়া একটু করুণার নেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, আর যাঁহারা ধর্ম্মের নামে মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তির ভয় দেখাইয়া সত্যকে বলপ্রয়োগে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টিত ছিলেন তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যেন অভিসম্পাত প্রদান করেন।

কথিত আছে যে এই প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করার অব্যবহিত পরেই গেলিলিও সেইখানেই একজন বন্ধুকে চুপে চুপে বলিয়াছিলেন "তবুও উহা (পৃথিবী) সচলা"। কিন্তু এই কিম্বদন্তী সত্য বলিয়া বোধ হয় না, কারণ ঐ বিচারালয়ে অপর কোনও ব্যক্তির প্রবেশের অধিকার ছিল না।

গেলিলিওর এই প্রতিজ্ঞাপত্র প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের নিকট পঠিত হইবার জন্য প্রেরিত হইল। গেলিলিওর তাৎকালিক ভীষণ মানসিক অবস্থার চিত্র চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত হইবার নহে। তাঁহার হৃদয় লজ্জায়, রোষে, ক্ষোভে, অপমানে একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি রোমে কিছুকাল অবরুদ্ধ থাকিয়া সীনা নামক স্থানে প্রেরিত হন। সেখান হইতে তাঁহার পল্লীভবন আরসেত্রী নামক স্থানে যাইতে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এখানে তাঁহার স্নেহময়ী কন্যা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে থাকেন। কিন্তু বিধাতা গেলিলিওকে বৃদ্ধবয়সে কন্যাশোকও দিলেন। ছয় দিবস যাইতে না যাইতে স্নেহময়ী কন্যা বৃদ্ধ পিতার বক্ষে মস্তক রাখিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

অপমানিত, ভগ্নহৃদয়, জরাগ্রস্ত গেলিলিওর তত্রাচ কর্ম্মে অনাসক্তি ছিল না। অবরুদ্ধ অবস্থাতেই তিনি গতিশীল দ্রব্যের গতিসম্বন্ধীয় নিয়মত্রয় (Laws of motion) সুস্পষ্ট ও সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এক হিসাবে এই গ্রন্থখানিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। যৌবনে তিনি পেণ্ডুলামের সমগতিত্ব ও পতনশীল দ্রব্যের গতিসম্বন্ধীয় নিয়ম (Laws of falling bodies) আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং অধুনা গতিশীল দ্রব্যের গতির নিয়মগুলি আবিষ্কার করিয়া তিনি গতিবিজ্ঞানের (dynamics) জন্মদান করিয়া গেলেন। যদিও এই শেষোক্ত নিয়মগুলি ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্ত্তা নিউটনের দ্বারা সম্যকরূপে আলোচিত হওয়াতে তাঁহার নামেই প্রচলিত, কিন্তু ঐগুলি গেলিলিওর এই গ্রন্থ হইতে যে গৃহীত তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অমূল্য গ্রন্থখানি গেলিলিও নিজে

প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহারই কোনও ছাত্র উহা হলাণ্ডদেশে লইয়া গিয়া লুক্কায়িতভাবে প্রকাশ করেন। গেলিলিও কেবল পরীক্ষামূলক জ্যোতিষের জন্মদাতা নহেন, তিনি গতিবিজ্ঞানেরও যে একজন প্রতিষ্ঠাতা তাহা এই গ্রন্থ হইতে সম্যক উপলব্ধি হয়।

বিধাতা মহাপুরুষের পরীক্ষা বিপদের ভিতর দিয়াই গ্রহণ করেন। তাই দেখিতে পাই ভক্ত বালক ধ্রুবকে বিমাতার নির্য্যাতনের ভিতর দিয়া তিনি পরীক্ষা করিলেন, প্রহ্লাদের ভক্তি বিষপান, অগ্নিদাহন, সমুদ্রে নিক্ষেপ প্রভৃতি যাবতীয় বিপদের মধ্যে অটুট থাকে কি না তাহাই তিনি বারবার দেখিয়া লইলেন। গেলিলিওর পরীক্ষা বুঝি এখনও সমাপ্ত হয় নাই, তাই তিনি গেলিলিওর দৃষ্টিশক্তিও কাড়িয়া লইলেন। প্রথম একটি চক্ষু ফুলিয়া উঠিল, ক্রমে উহা হইতে দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। শেষে দুইটি চক্ষুই অন্ধ হইয়া গেল। এই সময় তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গগত কবি রজনীকান্তের মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ভগবানের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করিতেন "আমায় সকল রকমে খর্ব্ব করেছো, গর্ব্ব করিতে চূর"।

তিনি এই সময়ে তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "তোমার প্রিয়বন্ধু এখন সম্পূর্ণরূপে অন্ধ। এখন হইতে এই চরাচর বিশ্ব, ঐ অনন্ত নভোমণ্ডল—যাহার সম্বন্ধে জ্ঞান আমি আমার অশ্রুতপূর্ব্ব আবিষ্কারের দ্বারা শতসহস্রগুণ বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হইয়াছি—আমার কাছে একেবারে রুদ্ধ! ইহাই যখন ভগবানের ইচ্ছা, তখন আমিও ইহাতে সন্তুষ্ট।" এই অন্ধ অবস্থায় তাঁহার শিষ্যবর্গ তাঁহার শুশ্রূষা করিত। ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন এই সময়ে ইটালী ভ্রমণ করিতে আসিয়া গেলিলিওর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান।

তখন তাঁহার বয়স মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর ছিল; বৃদ্ধ বয়সে যখন তিনিও অন্ধ হইয়া তাঁহার অমর কবিতাবলী স্বীয় কন্যাগণকে লিখিতে বলিতেন, তখন নিশ্চয়ই ইটালীর এই ঋষিকল্প অন্ধ-বৈজ্ঞানিকের চিত্র তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইত।

অবশেষে তাঁহার মুক্তির দিন আসিয়া দেখা দিল। আটাত্তর বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তাঁহার অমর আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গগত হইল। গেলিলিও মৃত্যুর শীতল অঙ্কে বিশ্রামলাভ করিয়া জীবনের সকল জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইলেন। মৃত্যুর পরেও তাঁহার বৈরীগণ তাঁহার উপর কৃপাদৃষ্টি করেন নাই। প্রথমে তাঁহারা তাঁহার যথারীতি সৎকার করিতে না দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে কোন স্মারকস্তম্ভ নির্ম্মাণের ঘোরতর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই অদূরদর্শী মূর্খেরা বুঝিতে পারে নাই যে তিনি স্বহস্তেই তাঁহার অশ্রুতপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা এমন অতুলনীয় অনিন্দ্যসুন্দর স্মারকস্তম্ভ রচিয়া গিয়াছেন যে তাহার জ্যোতিতে চিরদিনই দিক্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া থাকিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ল্যাভোয়াসিয়ে।

একজন ফরাসী রাসায়নিক বলিয়া গিয়াছেন,—"রসায়ন শাস্ত্র ফরাসীদেশীয় শাস্ত্র; ইহার জন্মদাতা অমরকীর্ত্তিসম্পন্ন ল্যাভোয়াসিয়ে"। এই উক্তিটি অযথা স্বদেশহিতৈষণাপ্রেরিত বা অতিরঞ্জিত নহে। বাস্তবিকপক্ষে যদি নব্যরসায়নের জন্মদাতা বলিয়া কোন একজন মহাপুরুষকে নির্দ্দেশ করিতে হয় তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় সে ব্যক্তি ফরাসীদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ল্যাভোয়াসিয়ে। তিনি প্রাচীন রসায়ন জগতে যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যেরূপভাবে তমসাবৃত ভ্রান্তধারণার মধ্যে সত্যের বিমল আলোক আনয়ন করিয়া সমগ্র ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজকে নূতন পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে নব্যরসায়নের জন্মদাতা না বলিয়া থাকা যায় না। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই মহাপুরুষকে উন্মত্ত ফরাসী বিপ্লবের সময় অকালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ঘাতকের হস্তে দেহ বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। একজন দর্শক সেই সময় বলিয়াছিলেন, "এইরূপ একজনের মস্তক কাটিয়া ফেলিতে এক মুহূর্ত্তও লাগে না, কিন্তু এইরূপ আর একটি মস্তিষ্ক এক শত বৎসরেও জন্মিবে কি না সন্দেহের বিষয়।"

এণ্টয়েন লোঁরা ল্যাভোয়াসিয়ে (Antion Laurent

Lovoisier) ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৬এ আগষ্ট তারিখে ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী প্যারিস নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গণিতশাস্ত্রবেত্তা, বিশ্বাকর্ষণের আবিষ্কর্ত্তা নিউটনের ঠিক এক শত বৎসর পরে ল্যাভোয়াসিয়ের জন্ম হয়।
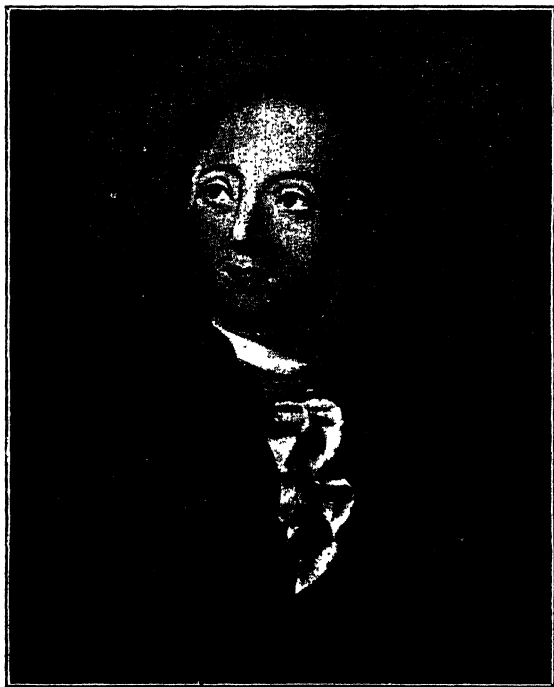
ল্যাভোয়াসিয়ে

পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে কোন ত্রুটি করেন নাই। এস্থলে বলা আবশ্যক, অনেক বৈজ্ঞানিক মহাপুরুষের বাল্যে এই সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই, অনেকেরই অর্থাভাবে বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা হয় নাই, পরে তাঁহারা স্বকীয় সাধনার বলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা অমর হইয়া গিয়াছেন। ল্যাভোয়াসিয়ে প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট গণিতশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে রসায়নের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ রাউলের অধ্যাপনায় তাঁহার দৃষ্টি রসায়নশাস্ত্রের উপর সমধিক পতিত হয়। অধ্যাপক রাউলের অধ্যাপনা সমগ্র ফরাসীদেশে প্রসিদ্ধ ছিল এবং ল্যাভোয়াসিয়ের সমসাময়িক অনেক প্রসিদ্ধ রাসায়নিক তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে পুত্র আইনশিক্ষা করেন এবং বাস্তবিক একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে ল্যাভোয়াসিয়ে আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষায় তাঁহার স্বাভাবিক আগ্রহ থাকাতে তিনি আইনব্যবসার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিলেন।

এই সময় হইতে তাঁহার রাসায়নিক গবেষণা আরম্ভ হইল। বাইশ বৎসর কালে তিনি তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ রচনা করেন। তাহার পরবৎসর "বৃহৎ নগর আলোকিত করিবার উপায়" নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-পরিষদ ফরাসী একাডেমী হইতে একটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন এবং সেই বৎসরেই ঐ পরিষদের সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। এই ফরাসী একাডেমী ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসীদেশে জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা

রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মাত্রেই এই পরিষদের সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া যুবক ল্যাভোয়াসিয়ের মৌলিক অনুসন্ধানের আগ্রহ বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। মৌলিক গবেষণার প্রবৃত্তি ঠিক সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ক্রিয়াশীল। যেমন কোন সংক্রামক ব্যাধি এক শরীর হইতে অপর শরীরে স্বতই সঞ্চারিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সংসর্গ গুণে নবাগত সাধকের সাধনার প্রবৃত্তি স্বতই উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই আকাঙ্ক্ষা যাঁহার হৃদয়ে একবার স্থান পাইয়াছে তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেমন এক দিকে বহু উচ্চ উপাধিধারী যুবক এইরূপ আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রাণিত হইতে না পারিয়া সাধনার মন্দির হইতে অকালে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ অপর দিকে অনেক ভাগ্যবান যুবক অল্প শিক্ষিত হইয়াও সংসর্গগুণে জ্ঞানার্জ্জনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় আকুল হইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

ফরাসী একাডেমীর সভ্যগণ বৎসর বৎসর নানাবিষয়ে বিবরণী প্রকাশ করিতেন। ল্যাভোয়াসিয়ের অসামান্য প্রতিভা ও নানা-বিদ্যায় পারদর্শিতা দর্শনে একাডেমীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ঐ সকল বিবরণী প্রকাশের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। তিনি কয়েক বৎসরে দুই শত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণী লিখিয়াছিলেন। এইরূপে ফরাসী একাডেমীর সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, সে সম্বন্ধ তিনি আজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ঘোর ফরাসী বিপ্লবের সময়, যখন সমস্ত বিদ্বৎসমাজ বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তাব চলিতেছিল, তখনও তিনি একাডেমীকে পিতৃবৎ রক্ষা করিতে সচেষ্ট ছিলেন। আপনার অর্থব্যয় করিয়া প্রাচীন জরাজীর্ণ

বৈজ্ঞানিকগণকে মাসিক বৃত্তি দিয়া একাডেমীকেই বাঁচায়া রাখিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। তাঁহার জীবদ্দশাতেই রাজাজ্ঞায় ফরাসী একাডেমীর অস্তিত্ব লোপ পাইল।

ল্যাভোয়াসিয়ের অর্থের কোনদিন অভাব ছিল না। মাতার মৃত্যুর পর তিনি বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। এই কারণে সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি অর্থাগমের অন্য উপায় অবলম্বন না করিয়া অনন্যমনে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকিবেন। কিন্তু ভবিতব্যতা তাহা ঘটিতে দিল না। তিনি যখন বিজ্ঞানের মন্দিরে এক পদ স্থাপন করিলেন, তখনই অজ্ঞাতসারে ফাঁসিকাষ্ঠের প্রথম সোপানে তাঁহার অপর পদ স্থাপিত হইল। তিনি ফারমিয়ে-জেনারল (Fermicr-General) হইলেন। তাঁহার সময়ে ফরাসীদেশে যাঁহারা রাজস্ব ও বাণিজ্যশুল্ক সংগ্রহ করিতেন, তাঁহারা ঐ নামে অভিভাসিত হইতেন। তাঁহারা খানিকটা তালুক ইজারা করিয়া লইতেন এবং রাজসরকারের সহিত ছয় বৎসরের রাজস্ব ও বাণিজ্যশুল্ক আগাম দিবার বন্দোবস্ত করিতেন। নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের উপর আরও অধিক মুদ্রা গোপনে রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গকে উপহার দিতে হইত। ফলে দরিদ্র প্রজার উপর যথেষ্ট অত্যাচার উৎপীড়ন হইত। ঘুষ, জুয়াচুরী, জুলুম ফারমিয়ের নিত্য সহচর ছিল। অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে রাজদ্বারে অভিযোগ করিলেও দরিদ্র প্রজাবর্গ সুবিচার প্রাপ্ত হইত না, উপরন্তু নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিতে সমর্থ না হইলে তাহাদিগকে বিষম শাস্তি ভোগ করিতে হইত। ফরাসী দেশের সর্ব্বত্রই উৎপীড়িত প্রজাবর্গ এই প্রথাকে মর্ম্মান্তিক ঘৃণার চক্ষে দেখিত। ইহাদের

মধ্যে সৎব্যক্তিও ছিলেন। ল্যাভোয়াসিয়ে জমিদারীর ভার গ্রহণ করিয়া নিজের এলাকার মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও সুবিচারের বন্দোবস্ত ও বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ভিন্নদেশ হইতে মেষাদি পশু আনয়ন করিয়া পশুর উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও উৎপীড়িত জনসাধারণের ঘৃণার দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পান নাই। শেষের দিনে তাঁহার অসাধারণ দেশহিতৈষিতা, অসামান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, পবিত্র চরিত্র প্রভৃতি সকল সদ্‌গুণই লোকে ভুলিয়াছিল—সেদিন ফারমিয়ে বলিয়াই সকলে তাহাকে মনে রাখিয়াছিল।

ল্যাভোয়াসিয়ের জীবন দুই প্রকার কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছিল—প্রথম বিজ্ঞানের সেবা, দ্বিতীয় দেশের সেবা। দেশের নানাবিধ মঙ্গলময় কার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন, রাজকীয় বিবিধ কার্য্যে তিনি রাজকীয় শক্তির সহায়তা করিতেন। বিশেষতঃ রাজসরকারে বারুদের কারখানার তিনি এক সময়ে অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি বারুদ ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর উন্নতি করিয়াছিলেন। যদি তিনি অনন্যমনে বিজ্ঞানের সেবা করিতেন, তাঁহার সমগ্র শক্তি বিজ্ঞানের চর্চ্চায় নিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে তিনি রসায়ন শাস্ত্রের কতদূর উন্নতি করিতে পারিতেন কে বলিতে পারে! যখন তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিল, তখন তিনি রাজনীতির কোলাহল-মুখরিত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানাগারের চিরশীতল শ্যামল স্নিগ্ধচ্ছায়ায় সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শত্রুবর্গ তাঁহাকে অব্যাহতি দেয় নাই।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে তিনি এবং আরও সাতাইশ জন ফারমিয়ে-জেনারাল রাজস্ব আত্মসাৎ করিবার আজুহাতে অভিযুক্ত হন। ল্যাভোয়াসিয়ে যে সকল অপরাধের জন্য রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তামাকে জল ও অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর পদার্থ মিশ্রিত করা তাহার অন্যতম। যে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় পিতা পুত্রকে ভুলিয়াছিল, বন্ধু বন্ধুর মস্তক ছেদন করিতে কিছুমাত্র কুন্ঠিত হয় নাই, সে সময়ে তামাকে জল দেওয়াও যে একটা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? বিচারপতি কফিনালের নিকট এই আটাইশ জন হতভাগ্য ব্যক্তির বিচার হইতেছিল। সেই সময়ে তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও দেশহিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহার মুক্তি ভিক্ষা করিয়া বহু গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র বিচারপতিকে প্রদান করা হয়। তাঁহার পক্ষের উকিল তাঁহার পক্ষ হইতে যে আবেদনপত্র উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ল্যাভোয়াসিয়ে তাঁহার আরব্ধ একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা শেষ করিবার জন্য সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কফিনাল সে সকল আবেদন পত্র ঠেলিয়া রাখিয়া বলিয়াছিলেন "ফরাসী সাধারণতন্ত্রে বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন নাই, ন্যায়বিচার হইলেই যথেষ্ট হইল।" তিনি ন্যায় বিচারে এই আটাইশ জন হতভাগ্য ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে এতই ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে তাড়াতাড়িতে জুরির মন্তব্য পর্য্যন্ত লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভবিতব্যের এমনই বিড়ম্বনা যে কয়েকমাস্ পরে যখন এই কফিনাল আবার রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন, তখন তাঁহার নিজকৃত ভ্রম অনুযায়ী জুরির মন্তব্য না লইয়াই তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে

হইয়াছিল। পরদিবস প্রাতে এই আটাইশ জন ব্যক্তি বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। ল্যাভোয়াসিয়ে তাঁহার শ্বশুরের মস্তক কর্ত্তিত হইতে দেখিলেন। তাঁহারা সকলে এমনই স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সহিত তাঁহাদের নিজ নিজ দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন যে উপস্থিত জনসংঘ তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোনও অপমানসূচক বাক্য অন্তিমকালে তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ লাভ করে নাই।

এইরূপে একান্নবৎসর বয়সে আধুনিক রসায়নের জন্মদাতা ল্যাভোয়াসিয়ে ঘাতকের হস্তে প্রাণ দিয়াছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমগ্র ইউরোপের বিদ্বৎসমাজ লজ্জিত, ক্ষুব্ধ, দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে রোবেস্পিয়ারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীদেশের জনসাধারণ নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিল। পর বৎসর লাভোয়াসিয়ের পুণ্যস্মৃতির সম্মান করিবার জন্য রাজসরকারের পক্ষ হইতে বিপুল আয়োজন সহকারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। ল্যাভোয়াসিয়ের পত্নী তাঁহার মৃত্যুর পর কাউণ্ট রমফর্ড নামক আর একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিককে বিবাহ করেন।

ল্যাভোয়াসিয়ে কিরূপে নব্যরসায়ন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে তাঁহার পূর্ব্বে রসায়ন শাস্ত্রের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা পর্য্যবেক্ষণ এবং তাঁহার সমসাময়িক অন্য অন্য রাসায়নিকগণের কার্য্যাবলীর আলোচনা করা আবশ্যক। ইউরোপে গ্রীক ও আরবীয়গণই বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। ভারতের অতীত গৌরবের যুগে হিন্দু আচার্য্যগণ যে সকল বিজ্ঞানের তথ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহার

পরিচয় সভ্যজগত ক্রমে ক্রমে পাইতেছেন। এবিষয়ে অনুসন্ধানের ক্ষেত্র এখনও অনেক পড়িয়া রহিয়াছে। এই অনুসন্ধানের গুরুভার এতদিন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপর ন্যস্ত ছিল, সেই ভার ক্রমে আমাদিগের নিজেদের স্কন্ধে আসিয়া পড়িতেছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফল ভাল বই মন্দ হইতেছে না, কারণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয়ে যতই ব্যুৎপন্ন হউন না কেন, তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি, স্বাভাবিক গ্রীকপ্রীতি এবং ভারতবর্ষের ভাষা ও আচার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত প্রায়ই ব্যাহত হইতেছে দেখা যায়। এই সকল অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাইতেছে যে ল্যাভোয়াসিয়ের প্রতিষ্ঠিত নব্যরসায়নের জন্মের পূর্ব্বে এক প্রাচীনতর রসায়ন যেমন ইউরোপ ও মিসরদেশে বর্ত্তমান ছিল, সেইরূপ ভারতের উর্ব্বর ক্ষেত্রেও উহার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালক্রমে বর্দ্ধিত, পুষ্পিত ও ফলশালী হইয়া উত্তরকালে শুকাইয়া গিয়াছিল। এমন কি, অনেক বিষয়ে ভারতের রসায়ন জ্ঞান তাৎকালিক গ্রীক ও আরবীয় রসায়নজ্ঞান অপেক্ষা উন্নতিশালী ছিল। ভারতের নাগার্জ্জুন, চক্রপাণি ইউরোপের পারাসেল্‌সসের অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

এই প্রাচীন রসায়নের উন্নতি দুইটি প্রধান বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া সাধিত হইয়াছিল—একটি, চিকিৎসার জন্য ঔষধ সংগ্রহ কার্য্য ; অপরটি কৃত্রিম উপায়ে নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা। ভারতে ও ইউরোপে উভয় স্থানেই এইরূপে রসায়ন শাস্ত্রের পুষ্টি সংসাধিত হইয়াছিল—তবে ভারতে চিকিৎসাই রসায়ন শাস্ত্রের মুখ্য অবলম্বন ছিল। যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞানের উন্নতি কল্পে রসায়ন শাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ না হইয়াছিল ততদিন উহার উন্নতি

দ্রুত হইতে পারে নাই। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রবার্ট বয়েল সর্ব্বপ্রথমে রসায়ন শাস্ত্রকে কৃত্রিম স্বর্ণপ্রস্তুতকারীদিগের কবল হইতে মুক্ত করিয়া উহাকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার জীবনব্যাপী চেষ্টায় রসায়ন শাস্ত্র রাসায়নিক জ্ঞানের উন্নতি কল্পে অধীত ও আলোচিত হইতে থাকে। স্বাধীন চিন্তায় উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় এবং তাহার ফলে মৌলিক গবেষণায় উহার কলেবর দিনদিন পুষ্ট হইতে থাকে। এইরূপে প্রাচীন রসায়ন হইতে নব্যরসায়নের জন্মের সম্ভাবনা সূচিত হয়।

প্রাচীন রসায়নের দ্বিতীয় ত্রুটি ছিল যে উহা পরিমাণাত্মক (quantitative) শাস্ত্র ছিল না। এই দ্রব্যের সহিত এই এই দ্রব্য সংযুক্ত হইলে অমুক দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কত পরিমাণ অপরাপর দ্রব্যের কত অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়া কত ওজনের দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা নির্ণিত হইত না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তুলাদণ্ডের প্রচলন প্রাচীন রসায়নে বড় একটা ছিল না। ল্যাভোয়াসিয়ে যে এক নব্যতর রসায়ন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার প্রধান রহস্য হইতেছে যে তিনি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পদে পদে তুলাদণ্ডের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে যাহা কেবল বস্তুগত শাস্ত্র ছিল তাহা পরিমাণাত্মক হইয়া দাঁড়াইল।

বস্তুর বিনাশ নাই।

"বস্তুর বিনাশ নাই" এই মহাসত্য ভারতের প্রাচীন দার্শনিকেরা যুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের

মতে পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্য পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত এবং দ্রব্যের বিনাশ হইলে পুনরায় তাহা পঞ্চভূতে পরিণত হয়; অর্থাৎ সৃষ্টি পঞ্চভূতের সমবায় এবং বিনাশ পঞ্চভূতে পরিণতি। এরূপ অনুমানে বস্তুর অবিনশ্বরত্ব বেশ স্পষ্টরূপে সূচিত হইয়াছে। ল্যাভোয়াসিয়ে এই অনুমানকে তুলাদণ্ডের কষ্টিপাথরে ঘসিয়া খাঁটি পরীক্ষামূলক সত্যে পরিণত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাচীনেরা তুলাদণ্ডের ব্যবহার বড় একটা শিখেন নাই, তাঁহারা যুক্তি কল্পনা ও অনুমানের সাহায্যে সত্যের সন্ধান করিতেন। বিজ্ঞান সেই সকল সত্যকে পরিমাণাত্মক পরীক্ষামূলক সত্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে। ল্যাভোয়াসিয়ে এই পরিমাণাত্মক বিজ্ঞানের একজন প্রধান স্থাপয়িতা।

বস্তুর অবিনশ্বরতা সপ্রমাণ করিবার জন্য ল্যাভোয়াসিয়ে নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি করিয়াছিলেন। একটি কাচনির্ম্মিত বড় বকযন্ত্রে (glass retort) নির্দ্দিষ্ট ওজনের রঙ্গ অর্থাৎ টিন বা রাং গ্রহণ করিয়া যতক্ষণ রাং গলিয়া না গিয়াছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাকে বালুকাযন্ত্রে উত্তপ্ত করিয়াছিলেন। উত্তাপ বশতঃ যেটুকু বায়ু বহির্গত হইয়া গেল তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া ওজন করিলেন, তৎপরে বকযন্ত্রের সরু মুখ গলাইয়া বন্ধ করিয়া ওজন করিলেন। বদ্ধাবস্থায় বকযন্ত্রকে পুনরায় উত্তপ্ত করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে রাং রাং-ভস্মে পরিণত করিতে লাগিলেন। বায়ু যত বেশী থাকিবে রাংও তত বেশী পরিমাণে ভস্মে পরিণত হইবে। যখন দেখিলেন আর রাংভস্মে পরিণত হইতেছে না তখন বকযন্ত্রকে ঠাণ্ডা করিয়া পুনরায় তাহার ওজন লইলেন। দেখিলেন তাহার ওজন কমেও নাই বাড়েও নাই, ঠিকই আছে। যদিও রাং রাংভস্মে

পরিণত হইয়াছে—যদিও এখানে একটা রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইয়াছে—তথাপি রাসায়নিক ক্রিয়ার পূর্ব্বে এবং পরে ওজন ঠিক আছে।

বকযন্ত্র ঠাণ্ডা হইলে তাহার সরু মুখ পুনরায় খুলিয়া ফেলিলেন এবং তখন দেখা গেল যে বাহিরের বায়ু সশব্দে বকযন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করিল। কেন প্রবেশ করিল?—রাং ভস্ম হইবার সময় ভিতরকার বায়ুর কিয়দংশ টানিয়া লইয়াছিল বলিয়া। বকযন্ত্রের মুখ খুলিবার সময় বাহিরের বায়ু ভিতরের সেই শূন্যস্থান অধিকার করিবার জন্য সশব্দে প্রবেশ করিল। ল্যাভোয়াসিয়ে পুনরায় এই বায়ুপূর্ণ বকযন্ত্র ওজন করিয়া দেখিলেন,—ওজন প্রায় দশ গ্রেণ বাড়িয়াছে। তৎপরে রাংভস্ম ও বাকি রাং একত্রে ওজন করিয়া দেখিলেন যে গৃহীত রাঙ্ অপেক্ষা রাঙ্ ভস্মের ওজন বাড়িয়াছে। রাংভস্মের ওজন কতটা বাড়িয়াছে?—তিনি দেখিতে পাইলেন বকযন্ত্রের ভিতরে বায়ুর ওজন যতটা কমিয়াছিল ঠিক সেই পরিমাণে রাং অপেক্ষা রাংভস্মের ওজন বাড়িয়াছে। উত্তপ্ত করিবার পর বদ্ধ বকযন্ত্রের মুখ ভাঙ্গাতে যতটুকু বায়ু প্রবেশ করিল,—তাহা হইতে বকযন্ত্রকে বদ্ধ করিবার পূর্ব্বে উত্তপ্ত করিবার সময় যতটুকু বাহির হইয়াছিল তাহার ওজন বাদ দিলে বায়ুর ওজন যতটা কমিয়াছিল তাহা পাওয়া যাইবে।

তবেই দেখা গেল যে রাংকে রাংভস্মে পরিণত করিবার সময় নূতন বস্তুর (matter) সৃষ্টি হয় নাই। নির্দ্দিষ্ট ওজনের রাং নির্দ্দিষ্ট ওজন বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া দুয়ের সমষ্টি ওজনের রাংভস্মে পরিণত হইয়াছে। সেইরূপ সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বস্তুর পরিবর্ত্তন হয় মাত্র, সৃজন বা

বিনাশ হয় না। সকলেই দেখিয়াছেন একটি বাতি পুড়িতে পুড়িতে কমিয়া যায়, মৃতদেহ শ্মশানে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছাই হইয়া যায়। জিজ্ঞাস্য এই যে, বাস্তবিক কি বর্ত্তিকা বা মৃতদেহের বিনাশ সাধিত হইল? দেখিতে পাই, সর্ষপ-প্রমাণ ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমে বৃহৎ বটবৃক্ষের উৎপত্তি হয়। জিজ্ঞাস্য এই যে, নূতন বস্তুর সৃষ্টি হইল কি? বাস্তবিক তাহা নহে। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে বাতি জ্বলিয়া বায়ুর অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া জল ও কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস উৎপন্ন করে এবং এই দুই পদার্থ সংগ্রহ করিয়া ওজন করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহাদের মিলিত ওজন বাতির ওজন অপেক্ষা কমত নহেই বরং বেশী। বেশী হইবার কারণ— সংযুক্ত অম্লজানের ওজন। সেইরূপ মৃতদেহ দগ্ধ হইয়া খানিকটা অংশ ভস্মে পরিণত হয়, খানিকটা অংশ জলীয় বাষ্প ও গ্যাসে পরিণত হয়। বীজ হইতে যখন সুবৃহৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তখন নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয় না। কোন অজানিত শক্তির বলে বীজ চারিদিক হইতে গ্যাস, জল, সার, বায়ু প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। যদি এই তাবৎ জল, সার প্রভৃতি ওজন করা যাইত তাহা হইলে দেখা যাইত যে তাহাদের মিলিত ওজন বৃক্ষের সমান। বাস্তবিক জগতে যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বস্তুর সৃজন বা বিনাশ হইত, তাহা হইলে এতদিনে বস্তুর আধিক্যে বা অল্পতাপ্রযুক্ত জগতের নাশ হইয়া যাইত। বস্তুর অবিনশ্বরত্বের উপর সমগ্র রসায়ন শাস্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। ল্যাভোয়াসিয়ে এই ভিত্তিকে পরিমাণাত্মক সত্যে পরিণত করিয়া রাসায়ন শাস্ত্রকে পরিমাণাত্মক শাস্ত্রে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।

ফ্লজিষ্টনবাদ।

প্রাচীন রসায়নে দুইটিমাত্র প্রধান অনুমান (theory) প্রচলিত ছিল—প্রথম, বৈশেষিকদর্শনকার কণাদ ও গ্রীক দার্শনিক ডিমক্রাইটস ও এপিকিউরাসের পরমাণুবাদ (atomic theory); এবং দ্বিতীয়, এরিষ্টটলের চতুর্ভূতবাদ ও হিন্দুদর্শনের উন্নততর পঞ্চভূতবাদ। ১৭২০ খৃঃ অব্দে জার্ম্মানির সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক ষ্টাল (Stahl) ফ্লজিষ্টনবাদ নামক তৃতীয় সংখ্যক অনুমান প্রচার করেন। তাঁহার জিজ্ঞাস্য হইল, দাহ্যবস্তু যখন জ্বলে তখন কি রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে? কাষ্ঠ, কয়লা, গন্ধক প্রভৃতি বস্তু অগ্নিসংযোগে জ্বলে কেন? লৌহ, যশদ, রাং প্রভৃতি ধাতু উত্তাপ সংযোগে যখন ভস্মে পরিণত হয়, তখন কি রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে? এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ষ্টাল শেষে ঠিক করিলেন যে, দাহ্যবস্তুমাত্রের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা দহনকালে ঐ বস্তু হইতে পৃথক হইয়া উড়িয়া যায়। তিনি সেই পদার্থের নাম দিলেন ফ্লজিষ্টন (Phlogiston)। যে দ্রব্যে ফ্লজিষ্টন যত বেশী আছে সে বস্তু তত বেশী দহনশীল। তাঁহার মত অনুসারে দহনক্রিয়া—তাহা কাষ্ঠদহনের ন্যায় দ্রুত হোক বা ধাতুমারণের ন্যায় মৃদু হউক —দাহ্যবস্তু হইতে ফ্লজিষ্টনকে পৃথক করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছু নহে। তাহা হইলে ধাতুভস্ম ফ্লজিষ্টনবিহীন ধাতুমাত্র। ষ্টাল জানিতেন যে সীসকভস্ম, রাংভস্ম প্রভৃতি ধাতুভস্ম, কয়লা প্রভৃতি অঙ্গারমূলক পদার্থের সহিত উত্তপ্ত হইলে পুনরায় মূলধাতুতে পরিণত হয়। এ বিষয়টি তিনি তাঁহার অনুমানের

সাহায্যে বেশ সহজে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে ধাতুভস্ম যখন ফ্লজিষ্টনবিহীন ধাতু ভিন্ন আর কিছুই নহে তখন তাহাতে কয়লার সাহায্যে ফ্লজিষ্টন সংযোগ করিয়া দিলে উহা পুনরায় ধাতুতেত পরিণত হইবেই।

ষ্টালের এই অনুমানের অনেকেই পরিপোষক হইয়া উঠিলেন। অনুমান যতদিন পর্য্যন্ত পরীক্ষিত তথ্যের বিরোধী না হয়, ততক্ষণ উহা গ্রহণীয়। ষ্টালের অনুমানের সত্যাসত্য একটি পরীক্ষামূলক তথ্যের উপর নির্ভর করিতেছিল। সেটি এই,—যদি ষ্টালের অনুমান সত্য হয়, অর্থাৎ দহনকালে যদি কোন পদার্থ বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে কোন দ্রব্য পুড়িয়া যাইলে তাহার ওজন অবশ্য কমিয়া যাইবে। একখণ্ড কাষ্ঠ পুড়িয়া যাইলে যে ভস্ম পাওয়া যায় তাহার ওজন অবশ্য কাষ্ঠের ওজন অপেক্ষা কম। কিন্তু কাষ্ঠদহনকালে ভস্ম ভিন্ন আরও অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। এই সকলের মিলিত ওজনের নির্ণয় করা কঠিন; সেইজন্য কাষ্ঠ দহনকালে কেবলমাত্র ভস্মের ওজনের দ্বারা ষ্টালের অনুমানের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ধাতুকে দগ্ধ করিলে কেবলমাত্র ধাতুভস্ম প্রস্তুত হয়। এখন দেখিতে হইবে, প্রাপ্ত ধাতুভস্মের ওজন মূলধাতুর ওজন অপেক্ষা কম না বেশী। যদি কম হয় ষ্টালের অনুমান যথার্থ, আর যদি বেশী হয় তাহা হইলে উহা ভ্রান্ত। ষ্টালের পূর্ব্বেই পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছিল যে ধাতুকে ভস্মে পরিণত করিলে তাহার ওজনত কমেই না বরং বাড়িয়া থাকে। রবার্ট রয়েল রাংকে ভস্মে পরিণত করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে গৃহীত রাং অপেক্ষা প্রাপ্ত রাংভস্মের

ওজন অনেক বেশী। জন মেয়ো নামক ইংলণ্ডের আর একজন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক এন্টিমনি নামক ধাতুকে ভস্ম করিয়া দেখাইয়া ছিলেন যে ধাতুভস্ম গৃহীত ধাতু অপেক্ষা ওজনে ভারী। ইঁহাদের পরীক্ষাব ফল ষ্টালের অবিদিত ছিল না; কিন্তু তিনি ইহার প্রতি বড় একটা মনোযোগ করেন নাই।

কিছুকাল পরে যখন এই বিষয়ে রাসায়নিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল তখন ফ্লজিষ্টনবাদের পক্ষপাতীগণের মধ্যে একটা গোল বাধিয়া গেল। কেহ কেহ ইহার একটা "উড়ো" মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য বলিলেন যে, ফ্লজিষ্টনের ওজন নাই, উহা মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট না হইয়া বরং বিপরীতদিকে উঠিয়া যায়। সুতরাং ইহার সংযোগে দ্রব্যের ওজন কমে ও বিয়োগে ওজন বাড়ে। এ একটা বড় অদ্ভুত মীমাংসা। যদি ফ্লজিষ্টন মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা আকৃষ্ট না হয় তাহা হইলে উহা কোন জাতীয় পদার্থ এবং কিরূপেই অপর পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইবে? অনেক দিনের পুঞ্জীভূত ভ্রান্ত ধারণা সহজে যায় না। এক্ষেত্রেও এইরূপ একটা কাল্পনিক মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইয়া তাৎকালিক রাসায়নিকগণ ফ্লজিষ্টনবাদের ভুল দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না।

এই ফ্লজিষ্টনবাদের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া রসায়নকে নূতন ভিত্তির উপর স্থাপন করা ল্যাভোয়াসিয়ের প্রধান গৌরবমণ্ডিত মহাকীর্ত্তি। তাঁহার সমসাময়িক ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাসায়নিক জোসেফ প্রিষ্টলে ও হেনরী কেভেণ্ডিস, স্কট্লণ্ডের জোসেফ ব্ল্যাক, সুইডেনের শিলে প্রভৃতি যাবতীয় রাসায়নিকই এই ফ্লজিষ্টন্‌বাদের পরিপোষক ছিলেন। তাৎকালিক সমগ্র রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষা ফ্লজিষ্টনবাদের ভাষা লইয়া গঠিত হইয়াছিল।

এরূপ ক্ষেত্রে নানা বাধাবিঘ্ন আপত্তি খণ্ডন করিয়া ল্যাভোয়াসিয়ে অকুতোভয়ে ফ্লজিষ্টনবাদ ভ্রমাত্মক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। নূতন কথা প্রথমে যখন প্রচারিত হয়, লোকে তখন তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করে না। শেষে সত্যের জয় অবশ্যই হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে প্রথমে অনেকেই ল্যাভোয়াসিয়ের বিরোধী হইয়াছিলেন। ক্রমে সত্যের জয় হইল। কিরূপে ল্যাভোয়াসিয়ে ফ্লজিষ্টনবাদের ভ্রম সম্যকরূপে দেখিতে পাইলেন, তাহাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে।

প্রিষ্টলে কর্ত্তৃক অম্লজানের (Oxygen) আবিষ্কার।

ধাতু অপেক্ষা ধাতুভস্মের ওজন অধিক এই সত্য আবিষ্কারের পর ফ্লজিষ্টনবাদের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত ধাতুভস্মের ওজনবৃদ্ধির হেতু সঠিক নির্ণীত না হইয়াছিল ততদিন ফ্লজিষ্টনবাদের বিরুদ্ধে ল্যাভোয়াসিয়ে কোনও নূতন মত প্রচার করিতে পারেন নাই। সেইজন্য ধাতুর সহিত কোন্ পদার্থ যুক্ত হইলে ধাতুভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ল্যাভোয়াসিয়ে সচেষ্ট থাকিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সমসাময়িক ইংলণ্ডের দুইজন প্রথিতনামা রাসায়নিক দুইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাসায়নিক তথ্যের আবিষ্কার করিলেন। জোসেফ প্রিষ্টলের (Joseph Pricstley) দ্বারা অম্লজান এবং হেনরি কেভেণ্ডিসের (Henry Cavendish) দ্বারা জলের রাসায়নিকস্বরূপ আবিষ্কৃত হইল। এই দুইটি আবিষ্কারের

ফলে ল্যাভোয়াসিয়ে ফ্লজিষ্টনবাদকে চিরদিনের জন্য রসায়নশাস্ত্র হইতে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অম্লজানের আবিষ্কর্ত্তা জোসেফ প্রিষ্ট্লে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লিড্স্ নামক সহরের নিকটবর্ত্তী ফিল্ডহেডস্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন এবং ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। বাল্যকালে তাঁহার রসায়নশাস্ত্রে শিক্ষালাভ ঘটিয়া উঠে নাই এবং উত্তরকালে তিনি ধর্ম্মযাজকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের নানাস্থানে ধর্ম্মযাজকের কর্ম্ম করিবার পর অবশেষে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে লিড্সে মিলহিল চ্যাপেলের ধর্ম্মযাজকের পদ প্রাপ্ত হন। সৌভাগ্যক্রমে (ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিলে বড়ই দুর্ভাগ্যক্রমে) তাঁহার গির্জ্জার ঠিক পাশেই মদ চুয়াইবার একটি কারখানা ছিল। অনেকেই জানেন যে, মদ চুয়াইবার সময় এক প্রকার "বায়ু" বাহির হইতে থাকে, তাহাকে আমরা এখন অঙ্গারাম্ল (carbonic acid gas) বলি। প্রিষ্ট্লের ইচ্ছা জন্মিল যে এই "বায়ু" তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই "বায়ু" পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া তিনি এতগুলি "বায়ুর" স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, তিনি "বায়বীয় রসায়নের জন্মদাতা" বলিয়া রসায়নশাস্ত্রে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

এখানকার মত দ্বিতল বা ত্রিতল নানা যন্ত্রসমন্বিত রসশালা *

* "রসশালা" Chemical laboratory অর্থে ব্যবহৃত হইল। রসরত্নসমুচ্চয়ে এই রসশালার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অতএব "রাসায়নিক পরীক্ষাগার" প্রভৃতি কথা গড়িবার দরকার নাই।

তখন ছিল না। প্রিষ্ট্‌লের রাসায়নিক যন্ত্রের মধ্যে কাচের লম্বা লম্বা শিশি, বোতল, ছিপি, জলপাত্র, পারদ, চামড়ার থলি প্রভৃতি সামান্য সামান্য দ্রব্য ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।
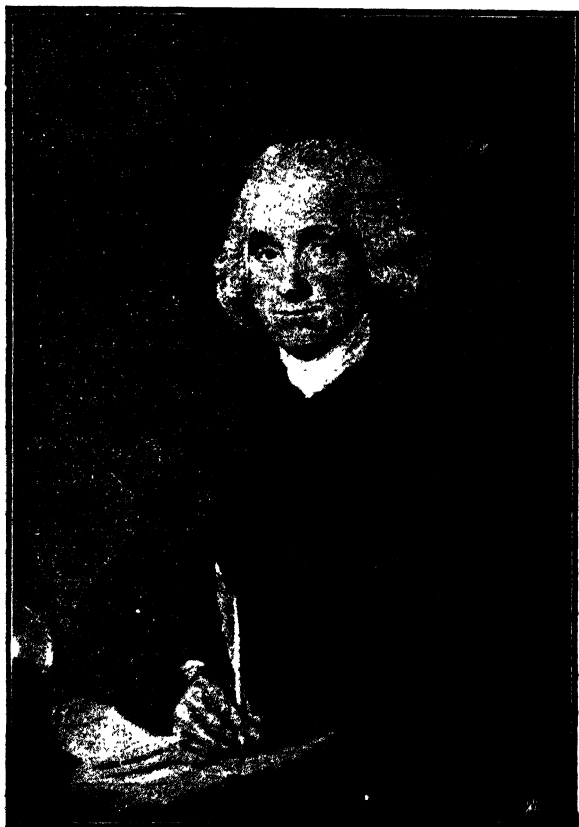
জোসেফ প্রিষ্টলে

কিন্তু এই সামান্য শিশি বোতলের সাহায্যে প্রিষ্ট্‌লে অম্লজানের আবিষ্কার, বায়ুর আংশিক স্বরূপ নির্ণয়, জলের স্বরূপ নির্ণয়ের পন্থা আবিষ্কার, হাইড্রোক্লোরিক এসিড গ্যাসের আবিষ্কার প্রভৃতি বিবিধ রাসায়নিক আবিষ্কারের দ্বারা রাসায়নিক জগতে বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নানাবিধ "বায়ু"র পরীক্ষার ফল তিনভাগে বিভক্ত একখানি বৃহৎ পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত আবিষ্কারের বর্ণনা করিবার স্থান আমাদের নাই; আমরা এখানে কেবল তাঁহার অম্লজানের আবিষ্কার সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

প্রিষ্টলের নিকট একটি ভাল আতসী কাচ (burning glass) ছিল। তিনি এই আতসী কাচের দ্বারা সূর্য্যতাপ একত্রীভূত করিয়া সেই তাপে নানা দ্রব্য পরীক্ষা করিতেছিলেন। এই উপায়ে লোহিত পারদভস্ম (red oxide of mercury) উত্তপ্ত করিবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, উহা হইতে একপ্রকার গ্যাস বাহির হইতেছে। এই গ্যাস পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, উহা সাধারণ বায়ু হইতে ভিন্নগুণসম্পন্ন। এই গ্যাসে মোমবাতী সাধারণ বায়ু অপেক্ষা অনেক ভাল জ্বলে। তিনি কয়েকটা ইঁদুর এই গ্যাসে এবং সমপরিমাণ সাধারণ বায়ুতে ছাড়িয়া দিয়া দেখিলেন যে ইঁদুর সাধারণ বায়ু অপেক্ষা এই গ্যাসে বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকে। তিনি নিজেও এই বায়ু শুঁকিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—

"এই গ্যাস শুঁকিবার সময় ফুস্ফুসের উপর উহার ক্রিয়া সাধারণ বায়ু হইতে ভিন্ন প্রকার বলিয়া অনুভব করি নাই, কিন্তু শুঁকিবার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত বক্ষদেশে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়াছিলাম। কালে হয়ত এই বায়ু

একটি বিলাসের সামগ্রী হইয়া উঠিবে। আজ পর্য্যন্ত আমার সহিত দুইটি ইঁদুরও এই বায়ু সেবনের সুখ অনুভব:করিয়াছে।"

প্রিষ্ট্‌লের ভবিষ্যদ্‌বাণী কতকটা সাফল্যলাভ করিয়াছে। যদিও অম্লজান এখনও বিলাসের সামগ্রী হয় নাই, তত্রাচ মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে অম্লজান শুঁকাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখা হয়।

এইরূপে লোহিত পারদভস্ম উত্তপ্ত করিয়া প্রিষ্ট্‌লে সাধারণ বায়ু হইতে ভিন্নগুণসম্পন্ন নূতন বায়ুর আবিষ্কার করিয়া অন্যান্য দ্রব্য হইতে উহা প্রাপ্ত হইতে সচেষ্ট হইলেন। মেটে সিন্দুর (red lead) উত্তপ্ত করিয়া দেখিলেন যে উহা হইতেও পূর্ব্বোক্ত বায়ু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে তিনি এই নূতন বায়ুর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে সপ্রমাণিত করিতে সমর্থ হইলেন। তিনিও একজন ফ্লজিষ্টনবাদী ছিলেন। এই নূতন বায়ুর নাম রাখিলেন। "ফ্‌জিষ্টনহীন বায়ু"। এই বায়ুতে মোমবাতি সাধারণ বায়ু অপেক্ষা ভাল জ্বলে, তাহার কারণ উহাতে সাধারণ বায়ু অপেক্ষা ফ্লজিষ্টন কম আছে—তিনি এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত হইলেন।

এই নূতন বায়ুর আবিষ্কার-সংবাদ ল্যাভোয়াসিয়ের নিকট দৈববাণীরূপে পৌছিল। তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি দেখিতে পাইল যে এই নূতন বায়ু ফ্লাজিষ্টনবাদের মোহময় আবরণ ভেদ করিবে। তিনি প্রথমে প্রিষ্টলের পরীক্ষার বিচার করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার চিন্তাস্রোত প্রিষ্টলের বিপরীতগামী হইল। তিনি ভাবিলেন যে যখন মোমবাতি সাধারণ বায়ু অপেক্ষা এই নূতন বায়ুতে অধিকতর উজ্জ্বলভাবে জ্বলে, তখন সাধারণ বায়ুতে এই নূতন বায়ু

অন্য কোনপ্রকার বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া আছে, এবং বাতি জ্বলিবার সময় এই নূতন বায়ু বাতির উপাদানের সহিত সংযুক্ত হয়। তিনি সাধারণ বায়ু হইতে এই নূতন বায়ু আহরণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া খানিকটা নির্দ্দিষ্ট ওজনের পারদ একটি বকযন্ত্রে (retort) গ্রহণ করিলেন। এই বকযন্ত্রের মুখ, একটি পারদপাত্রে আংশিকভাবে নিমজ্জিত বায়ুপূর্ণ ঘণ্টাকৃতি কাচপাত্রে (bell-jar) প্রবেশ করাইয়া দিলেন। প্রথমে একখণ্ড কাগজের দ্বারা কাচপাত্রে বায়ুর পরিমাণ মাপ করিয়া লইয়া বকযন্ত্রস্থিত পারদকে দ্বাদশ দিবস অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেখা গেল যে বায়ুর পরিমাণ প্রায় ছয় ভাগের একভাগ কমিয়া গিয়াছে এবং বকযন্ত্রস্থিত পারদের উপর লোহিতবর্ণের পারদভস্ম প্রস্তুত হইয়াছে। কাচপাত্রস্থিত অবশিষ্ট বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে উহাতে আর বাতি জ্বলিতেছে না। পরে এইরূপে প্রাপ্ত লোহিত পারদভস্ম উত্তপ্ত করিয়া তিনি উহা হইতে এই নূতন বায়ু অনেক খানি প্রাপ্ত হইলেন। এই পরীক্ষার দ্বারা তিনি সাধারণ বায়ুতে এই নূতন বায়ুর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে সপ্রমাণিত করিতে পারিলেন। আরও তিনি দেখাইলেন যে পারদ সাধারণ বায়ুস্থিত এই নূতন বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া পাদভস্মে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপে অন্যান্য ধাতুও এই নূতন বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া ধাতুভস্মে পরিণত হয়। এতদিনে তিনি যাহা অন্বেষণ করিতেছিলেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন। তিনি এই নূতন বায়ুর নাম রাখিলেন "অম্লজান"।

এখন তিনি প্রচার করিলেন যে ফ্লজিষ্টনবাদ নিতান্ত ভ্রান্ত। ধাতু ভস্ম হইলে তাহার ওজন কমে না, বরং বাড়িয়া থাকে।

এই ওজন বৃদ্ধির কারণ আর কিছুই নয়—ধাতু সাধারণ বায়ুর অন্যতম উপাদান অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। যখন ধাতুভস্ম অঙ্গার প্রভৃতির সহিত উত্তপ্ত হইয়া ধাতুতে পরিণত হয়, তখন অঙ্গার ধাতুভস্মের অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া অঙ্গারাম্লে (carbonic acid gas) পরিণত হয় এবং অসংযুক্ত ধাতু পড়িয়া থাকে। ফ্লজিষ্টন বলিয়া কোন পদার্থ নাই এবং উহা কষ্টকল্পনা মাত্র। প্রথম প্রথম তাঁহার নূতন মতের কেহই পোষকতা করিল না। কিন্তু শেষে সত্যেরই জয় হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহারই জীবদ্দশাতেই ডি মরভিউ, বার্থোলে, ফুরক্রয় প্রভৃতি ফরাসী এবং ব্ল্যাক প্রভৃতি স্কচ রাসায়নিকগণ তাঁহার মতের পোষকতা করিলেন। কেবল প্রিষ্টলে ও কেভেণ্ডিস আজীবন ফ্লজিষ্টনবাদী রহিয়া গেলেন।

কেভেণ্ডিস কর্ত্তৃক জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ।

কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ল্যাভোয়াসিয়ের অম্লজানবাদ একটি বিষয়ের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার পূর্ব্বেই জানা ছিল যে যশদ (zinc) প্রভৃতি ধাতু যখন জলীয় হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অম্লে দ্রবীভূত হয় তখন উদজান (hydrogen) নামক একটি খুব লঘু গ্যাস বাহির হইতে থাকে এবং ধাতু ভস্ম হইয়া অম্লের সহিত সংযুক্ত হইয়া লবণে (salt) পরিণত হয়। ফ্লজিষ্টনবাদীরা বলিতেন যে এই অতি লঘু উদ্‌জানই ফ্লজিষ্টন ; এবং অম্ল সংযোগে ধাতু হইতে ফ্লজিষ্টন বাহির হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট ধাতুভস্ম পড়িয়া থাকে। ল্যাভোয়াসিয়ে ইহার উত্তরে বলিলেন যে এই উদ্‌জান বায়ু লঘু হইলেও উহার ওজন আছে,

তবে উহা বাহির হইয়া যাইলে কেমন করিয়া ধাতুভস্মের ওজন ধাতু অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে? তিনি ফ্লজিষ্টনবাদীদের ভ্রম দেখাইয়া দিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার নিজ মতানুযায়ী কোন ভাল মীমাংসা তিনি করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এমন সময়ে ইংলণ্ডের তাৎকালিক অন্যতম প্রধান রাসায়নিক কেভেণ্ডিস জলের রাসায়নিকস্বরূপ নির্ণয় করিলেন। প্রাচীন গ্রীকগণের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি মৌলিক পদার্থের সমবায়ে পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের উৎপত্তি। প্রাচীন ভারতের মনীষীগণ এই চারি ভূত ভিন্ন ব্যোম নামক সূক্ষ্মতর পঞ্চম মৌলিক পদার্থের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের কঠোর হস্তে পড়িয়া অজ্ঞাতকুলশীল "ব্যোম" ভিন্ন অপর চারি ভূতের ভূতত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে। প্রিষ্টলে, কেভেণ্ডিস, সিলে, ল্যাভোয়াসিয়ের গবেষণায় সাধারণ বায়ু অম্লজান ও নাইট্রোজেন নামক দুই মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ বলিয়া সপ্রমাণিত হইয়াছে। কেভেণ্ডিস জলের যৌগিকত্ব সপ্রমাণ করিলেন। হেনরি কেভেণ্ডিস বড়ঘরের সন্তান ছিলেন—ডিউক অব ডেভনসায়ারের পৌত্র এবং লর্ড চার্লস কেভেণ্ডিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর বয়সে মাতৃহীন হন। তিদি প্রথমে হেক্‌নী স্কুলে পরে কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি কেমন-এক-রকমের লোক ছিলেন, কাহারও সঙ্গে মিশিতেন না, খুব অল্পই কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং যদিও তিনি অনেক লিখিয়া গিয়াছেন কিন্তু এমনি তাঁহার নাম প্রকাশের ভীতি ছিল যে তাঁহার লেখা খুব অল্পই প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি শেষ বয়সে প্রভূত ধনশালী হইয়া-

ছিলেন। কিন্তু তাঁহার খরচ কিছুই ছিল না। নিজের পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি কখনও দৃক্‌পাত করিতেন না এবং তাঁহার বাটীর আসবাব পত্র তাঁহার প্রকৃতির অনুযায়ীই ছিল। বাটীর যেটি বৈঠকখানা সেই ঘরটিকেই তিনি তাঁহার প্রধান যন্ত্রাগার

কেভেণ্ডিস

করিয়াছিলেন; দোতালার ঘরগুলিকে তিনি মানমন্দিরে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে একটি মাত্র ভৃত্য তাঁহার নিকটে ছিল; কিন্তু তিনি যখন বুঝিলেন যে তাঁহার শেষ মুহূর্ত্ত

উপস্থিত তখন সে ভৃত্যকেও বিদায় করিয়া দিলেন, এবং আদেশ করিলেন যেন সে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া না আসে। ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে তাহার প্রভুর মৃত্যু হইয়াছে।

এই চিরনির্জ্জনতাপ্রিয়, সংসারবিরাগী ও কথঞ্চিৎ বিকৃত-মস্তিষ্ক ইংরাজ, তাঁহার সমগ্র জীবন, সাধনানিরত ভারতের যোগীর ন্যায়, বিজ্ঞানের সেবায় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্রে, জ্যোতিষে ও রসায়নে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এ সকল বিষয়ে যে শুধু তাঁহার অসামান্য জ্ঞান ছিল তাহা নহে, তিনি এই সকল বিদ্যায় ভূরি ভূরি মৌলিক গবেষণাও করিয়া গিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ, বায়ুর পরিমাণাত্মক রাসায়নিক বিশ্লেষণ, তাপ সম্বন্ধীয় পরিমাণাত্মক নিয়ম আবিষ্কার এবং জলের যৌগিকত্ব সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূতই তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও পরীক্ষার অতীত ছিল না। তিনি ল্যাভোয়া-সিয়ের মত তুলাদণ্ডের ব্যবহার প্রত্যেক পরীক্ষায় করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য কোন কোন ইংরাজ তাঁহাকেই রসায়ন-শাস্ত্রের জন্মদাতা বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন।

কেভেণ্ডিস যে পরীক্ষার দ্বারা জলের যৌগিকত্ব সপ্রমাণিত করিয়াছিলেন, প্রিষ্ট্‌লে তাঁহার পূর্ব্বে সেই পরীক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ঐ পরীক্ষার গূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন করিতে সমর্থ হন নাই। প্রিষ্ট্‌লে একটি কাচপাত্রে উদ্‌জান ও সাধারণ বায়ু একত্র মিশাইয়া তাহা বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের (electric sparks) দ্বারা দগ্ধ করিলেন। এই দুই দ্রব্য সংযুক্ত হইলে পর তিনি দেখিতে পাইলেন যে কাচপাত্রের ভিতরটা অল্প অল্প জলবিন্দুতে

সিক্ত হইয়াছে। তিনি মনে করিলেন যে এই জল উদ্‌জান ও বায়ুর রাসায়নিক সংযোগে আসে নাই, উহা বোধ হয় বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প হইতে আসিয়াছে। মোট কথা তিনি এই জলের প্রতি আদৌ মনোযোগ করেন নাই। করিলে তিনিই জলের রাসায়নিক উপাদানের আবিষ্কারের খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিতেন। কেভেণ্ডিস প্রিষ্টলের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করিয়া মনে মনে ঠিক করিলেন যে এইরূপে প্রাপ্ত জল একটা অবান্তর পদার্থ নহে; উহা উদ্‌জান ও বায়ুর অম্লজানের সংযোগে উৎপন্ন হইতেছে। ক্রমশঃ তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখাইলেন যে সমস্ত উদ্‌জান গ্যাস ও সাধারণ বায়ুর পঞ্চমাংশ একত্র সংযুক্ত হইয়া জলে পরিণত হয় এবং এক সময়ে তিনি ১৩৫ গ্রেণ বিশুদ্ধ জল এই উপায়ে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জলের কোনও স্বাদ বা গন্ধ ছিল না এবং উত্তপ্ত করিলে উহার সমস্ত অংশই বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইত।

কেভেণ্ডিস ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বায়ুর পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ অম্লজান গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখাইলেন যে একভাগ পরিমাণ অম্লজান ও দুইভাগ পরিমাণ উদ্‌জান মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ করিলে সমস্ত গ্যাসই জলে পরিণত হয়, অসংযুক্ত অম্লজান বা উদ্‌জান অবশিষ্ট থাকে না। অতএব দুই ভাগ পরিমাণ উদ্‌জান্ ও এক ভাগ পরিমাণ অম্লজান সংযুক্ত হইলে বিশুদ্ধ জল উৎপন্ন হয়।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কেভেণ্ডিসের একজন বন্ধু ও সহকারী—সার চার্লস ব্ল্যাগডেন, কেভেণ্ডিসের এই সকল পরীক্ষার ফল ল্যাভোয়া-সিয়ের গোচরে আনয়ন করেন। ল্যাভোয়াসিয়ে তৎক্ষণাৎ

কেভেণ্ডিসের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করিয়া অনেকখানি জল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আরও জলীয় বাষ্পকে একটি পোর্সিলেনের নলে উত্তপ্ত লৌহের উপর চালনা করিয়া উহা হইতে উদ্‌জান বায়ু প্রাপ্ত হইলেন। এই পরীক্ষায় জলীয় বাষ্প বিযুক্ত (decomposed) হইয়া উদ্‌জান ও অম্লজানে পরিণত হয় এবং অম্লজান গ্যাস লৌহের সহিত সংযুক্ত হইয়া অক্সাইড অব আইরনে পরিণত হইয়া থাকে ও উদ্‌জান বাহির হইয়া আসে। এখন এই দ্বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা জলের রাসায়নিকস্বরূপ সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না।

ল্যাভোয়াসিয়ে কেবল মাত্র এই সকল পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকিলেন না। কেভেণ্ডিস ফ্লজিষ্টনবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত না হওয়াতে এই সকল পরীক্ষার মধ্যে নিহিত গূঢ় সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। ল্যাভোয়াসিয়ের অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি উহার সন্ধান পাইয়াছিল। তিনি এখন দেখিতে পাইলেন যে এই আবিষ্কার ফ্লজিষ্টনবাদীদিগের শেষ আশাও নির্ম্মূল করিবে। এতদিন তিনি ধাতু ও জলীয় অম্লের সংযোগে উদ্‌জান কেন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে এখানে নিম্নলিখিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধিত হইতেছে—প্রথমে জল বিযুক্ত হইয়া অম্লজান ও উদ্‌জানে পরিণত হয় এবং পরে অম্লজানের সহিত ধাতু সংযুক্ত হইয়া ধাতুভস্মে পরিণত হইয়া থাকে। সেই ধাতুভস্ম অম্লের সহিত সংযুক্ত হইয়া লবণে (Salt) পরিণত হইয়া থাকে এবং উদ্‌জান-বায়ু অবিকৃত অবস্থায় বাহির হইয়া আসে। অতএব ধাতু ও জলীয় অম্লের সংযোগে কাল্পনিক ফ্লজিষ্টনের উদ্ভবের কোনও

সম্পর্ক নাই, জলের বিয়োগে একদিকে উদ্‌জান বায়ু বহির্গত হয় ও অপর দিকে ধাতুভস্ম প্রস্তুত হয়। এতদিনে ল্যাভোয়াসিয়ের জীবনব্রত উদ্‌যাপিত হইল।

ল্যাভোয়াসিয়ে কর্ত্তৃক ফ্লজিষ্টনবাদের উচ্ছেদের বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় কেমন করিয়া ধীরে ধীরে একটির পর আর একটি করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয়। কত অক্লান্ত পরিশ্রম, অনন্ত সহিষ্ণুতা, বিচিত্র ভাবপ্রবণতা এক একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কারকাহিনীকে চিরগৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। এই ফ্লজিষ্টনবাদের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য কত মহাপুরুষ সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন—রবার্ট বয়েল, হুক, মেয়ো, ব্ল্যাক, প্রিষ্টলে, সিলে, বার্গমান, কেভেণ্ডিস, কারওয়ান, রদারফোর্ড, জেমস্ ওয়াট ও সর্ব্বোপরি ল্যাভোয়াসিয়ের গৌরবমণ্ডিত নাম ইহার সহিত জড়িত আছে। ইংরাজিতে একটি কথা আছে—"A chemist is the most patient animal, even the ass not excepted".—চিরসহিষ্ণু গর্দ্দভ অপেক্ষাও রাসায়নিককে সহিষ্ণু হইতে হয়। কেহ অশেষ সহিষ্ণুতা সহকারে সমগ্র জীবন কেবল নানাবিধ পরীক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছেন, কেহ কেহ আবার এই সকল পরীক্ষাকে ভিত্তিস্বরূপ ধরিয়া তাহার উপর কোন নূতন অনুমান প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মূল কথা সকলেই সাধনাকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া গিয়াছেন—জ্ঞানের উন্নতিকেই একমাত্র ধ্রুব সত্য মনে করিয়া জ্ঞানের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন যে কল্পনাশক্তি কেবল কবিরই প্রয়োজন কথাটা কিন্তু আদৌ ঠিক নহে;—কি কবি, কি দার্শনিক, কি

বৈজ্ঞানিক, সকলেরই কল্পনাশক্তি, ভাবপ্রবণতা সমান প্রয়োজন। এই কল্পনাশক্তির বলে বৈজ্ঞানিক স্থূলে সূক্ষ্ম দেখেন, দূর অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আবর্ত্তন নয়নের সম্মুখে দেখিতে পান, জড়-জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়, আবর্ত্তনবিবর্ত্তন, আকৃতিবিকৃতি না দেখিয়াও দেখিতে পান। এই কল্পনাশক্তি, এই ভাবপ্রবণতা, এই সূক্ষ্মদৃষ্টি ল্যাভোয়াসিয়ের মধ্যে বহুল পরিমাণে ছিল। অপরে যেখানে উল্টা দেখিতেছিলেন সেখানে তিনিই কেবল সবই সোজা দেখিলেন। অপরের ও নিজের পরীক্ষার মধ্যে সত্য কোন অন্ধকারময় গহ্বরে লুক্কায়িত আছে তাহা তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই। তাঁহার বিশেষত্ব এইখানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ল্যাভোয়াসিয়ে এইরূপে ফ্লজিষ্টনবাদকে রসায়নশাস্ত্র হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া প্রাচীন রসায়নকে নূতনভাবে গঠিত করিতে লাগিলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ডি মরভিউ, বার্থোলে, ফুরক্রয় প্রভৃতি ফরাসী রাসায়নিকগণ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। পূর্ব্বে যাবতীয় রাসায়নিক পরিভাষা ফ্লজিষ্টনবাদের অনুযায়ী ছিল, এখন তাহা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নূতন পরিভাষার সৃষ্টি হইল ও তিনি একখানি নূতন রাসায়নিক গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই গ্রন্থ চিরদিন রসায়নশাস্ত্রের প্রত্যেক ছাত্রের নিকট পরম আদরণীয় হইয়া থাকিবে। এই গ্রন্থে তিনি জড়পদার্থকে তিনভাগে বিভক্ত করিলেন—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। তাহার পর বায়ুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ—অম্লজান, এজোট, (Azote, বা Nitrogen) জলীয় বাষ্প, অঙ্গারাম্ল প্রভৃতির সংমিশ্রণ। পূর্ব্বেকার "ফ্লজিষ্টিকেটেড্ বায়ু", "ফজিষ্টনহীন বায়ু", প্রভৃতি কথা একেবারে উঠাইয়া দিলেন। জলের রাসায়নিক

বিশ্লেষণ, অম্ল, ক্ষার, লবণ প্রভৃতি রাসায়নিক বিভাগ ও পরিভাষা লিপিবদ্ধ করিলেন। আধুনিক রসায়নের যতটুকু জ্ঞাতব্য বিষয় তৎকালে ছিল সমস্তই গুছাইয়া নিজের মনোমত করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

ল্যাভোয়াসিয়ের অপর বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশদ পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব হইবে না। কেবল একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ল্যাভোয়াসিয়ে প্রাণি-সমূহের শ্বাসপ্রশ্বাস-গ্রহণের মধ্যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহারও আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখাইলেন যে প্রাণিগণের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ, ধাতুভস্ম-প্রস্তুত-পদ্ধতি এবং দহনক্রিয়া এই তিন প্রক্রিয়ার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন এক রকমের। প্রাণীগণ শ্বাস লইবার সময় শরীরের মধ্যে বায়ু গ্রহণ করে; বায়ুর অম্লজান শরীরের ভিতর ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অঙ্গারাম্লে পরিণত হয় এবং উহা বায়ুর নাইট্রোজেনের * সহিত প্রশ্বাসরূপে বাহির হইয়া আসে। ধাতুভস্ম-প্রস্তুত-পদ্ধতি ও দহনক্রিয়া এই অম্লজানের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে।

ল্যাভোয়াসিয়ে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রাণিদেহের ঘর্ম্ম

---

* ঠিক স্মরণ নাই, বোধ হয় স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় Nitrogenকে 'যবক্ষারজান' করিয়াছিলেন। তাহার কারণ 'যবক্ষার' অর্থে 'সোরা' বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু বৈদ্যকগ্রন্থে যব পুড়াইয়া যে ক্ষার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকেই "যবক্ষার" বলা হইয়াছে—উহা ক্ষার বিশেষ, সোরা আদৌ নহে। মৎপ্রণীত "আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য রসায়ন—'যবক্ষার" দেখুন। সেইজন্য আমি Nitrogenকে "নাইট্রোজেন" বা "নেত্রজান" করিলাম—"যবক্ষারজান" করিলাম না।

লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। কতকটা কাজ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি যখন রাজদ্বারে অভিযুক্ত, সেই সময় এই কাজটি শেষ করিবার জন্য তিনি বিচারকের নিকট সময় ভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিচারপতি কফিনাল ফরাসী সাধারণতন্ত্রে বৈজ্ঞানিকের কোনও প্রয়োজন দেখিলেন না; তিনি জুরির মন্তব্য না লিখিয়াই এই মহাপুরুষকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তৎপর দিবস তাঁহার নশ্বর দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ মস্তিষ্ক-প্রসূত কার্য্যাবলীর পুণ্যস্মৃতি আজ বিশ্বের বহু নরনারী সাদরে পূজা করিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাইকেল ফ্যারাডে।

আমি যদি বলি যে, যে খোঁট্টা বালক "বেঙ্গলি" বা টিস্‌মান" কাগজ প্রত্যহ প্রাতে আপনার বাটীতে দিয়া আসে, সে বা তাহার দলের মধ্যে একজন কালক্রমে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ন্যায় বৈজ্ঞানিক হইয়া উঠিয়াছে, অথবা চাঁদনির চকে দপ্তরির দোকানে যে সকল ছোট ছোট ছেলে বহি ও খাতা বাঁধে তাহাদের মধ্যে একজন মন্ত্রশক্তিবলে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত একজন রাসায়নিক হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইলে আপনি হে পাঠক! আমার কথায় কি বিশ্বাস করিতে পারেন? আপনি বিশ্বাস করুন বা নাই করুন—অদ্য আপনাদিগকে যে মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত শুনাইব বলিয়া মনে করিয়াছি, তাঁহার জীবনে এরূপ অসম্ভব বাস্তবিকই সম্ভব হইয়াছিল। দরিদ্র কামারের সন্তান মাইকেল ফ্যারাডে বাল্যকালে দপ্তরি ও সংবাদপত্রবাহকের কর্ম্মই করিতেন, ভবিষ্যৎ জীবনে তিনিই পৃথিবীর একজন অদ্বিতীয় রাসায়নিক ও পদার্থতত্ত্ববিৎ বলিয়া অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। একজন চিন্তাশীল লেখক প্রতিভার (genius) স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়া গিয়াছেন "Genius consists in the capacity of taking unlimited pains" অর্থাৎ অশেষ পরিশ্রম করিবার ক্ষমতাই প্রতিভার লক্ষণ। কিন্তু মনে হয় যে পরিশ্রম করিবার ক্ষমতাতেই কেবল প্রতিভার

পরিচয় পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আরও কিছু—দৈব, অতি-মানুষিক—মানসিক ও নৈতিক শক্তি—প্রতিভাতে প্রচ্ছন্ন আকারে বিরাজ করে। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কোন প্রকার সুকৃতি না থাকিলে কামারের সন্তান মাইকেল ফ্যারাডে কোন্ পুণ্যবলে আজ বিশ্বের এতগুলি নরনারীর পূজনীয় হইয়া গিয়াছেন?

মাইকেল ফ্যারাডে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ২২এ সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী সরে নামক কাউন্টিতে নিউইটন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতামাতাব তৃতীয় সন্তান ছিলেন এবং তাঁহার জন্মের পর তাঁহার পিতা পল্লীগ্রাম হইতে চিরদিনের জন্য লণ্ডনে উঠিয়া আইসেন। তাঁহার পিতার আর্থিক অসচ্ছলতা এত বেশী ছিল যে ১৮০১ খৃষ্টাব্দের অন্নকষ্টের সময় তাঁহাদিগকে দাতব্য সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সময় মাইকেলকে কখনও একখানি রুটি মাত্র খাইয়া সাত দিবস বাঁচিয়া থাকিতে হইয়াছিল। দরিদ্রের সন্তান মাইকেলের লেখাপড়া আর কি করিয়া হয়, তত্রাচ তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে স্কুলে দিয়াছিলেন। বালক মাইকেল স্কুলে লিখিতে, পড়িতে ও সামান্য অঙ্ক কসিতে শিখিয়াছিল।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মাইকেল ফ্যারাডে জর্জ্জ রিবো নামক একজন পুস্তকবিক্রেতা ও দপ্তরির দোকানে সংবাদবাহকরূপে নিযুক্ত হইল। বাড়ী বাড়ী সংবাদ পত্র বহন করা তাঁহার প্রধান কাজ ছিল। হয়ত এক বাটী হইতে অপর বাটীর ব্যবধান এক মাইলেরও উপর হইবে। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে মাইকেল

বইবাঁধার কার্য্যে শিক্ষানবিশভাবে নিযুক্ত হইলেন। বইত অনেকেই বাঁধে, কিন্তু সেই সকল বই পড়িবার প্রবৃত্তিত সকলের থাকে না। মাইকেলের মধ্যে যে প্রতিভা ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃসলিলা হইয়া রহিয়াছিল তাহাই তাহাকে এই সকল পুস্তক পাঠে নিয়োজিত করিল। মাইকেল বাঁধিবার জন্য বই পাইলেই উহা আগে পড়িয়া লইতেন। বিজ্ঞানের বই তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে ওয়াট্‌স্ সাহেবকৃত "মনস্তত্ব" প্রথমে তাঁহাকে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছিল এবং মিসেস মার্সেট কৃত "রাসায়নিক কথাবার্ত্তা" ও "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের মধ্যে "বিদ্যুৎ" নামক প্রবন্ধ তাঁহার মনকে প্রথম বিজ্ঞানের দিকে চালিত করে।

যে বিজ্ঞানের চর্চ্চায় তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন সমুজ্জ্বল হইয়াছিল সেই বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় এইরূপ অতি দীনভাবেই ঘটিয়াছিল। মাইকেলের স্বভাবসুলভ সরলতা ও সুমিষ্ট কথাবার্ত্তার জন্য তাঁহার প্রভুর গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে মিষ্টার জন্স নামক এক ব্যক্তি ফ্যারাডেকে রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হাম্‌ফ্রী ডেভীর বক্তৃতা শ্রবণের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তখন ইংলণ্ডে সর্ব্বসাধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা এক রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশন ভিন্ন অন্য কোথাও হইবার বন্দোবস্ত ছিল না। তখনও পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের অধিবাসীরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভিন্ন সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাদি হওয়া উচিত। এখন ইংলণ্ডে সর্ব্বসাধারণকে বৈজ্ঞানিকজ্ঞান বিতরণ করিবার জন্য নানা সভাসমিতি হইয়াছে। অধ্যাপক ষ্টুয়ার্ট এই সকল

সভাসমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ইংলণ্ডবাসীদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভিন্ন অপরে বিজ্ঞান শিখিবার সুবিধা আদৌ পায় না। যে সকল যুবক নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিতে পারে না তাহারা বিজ্ঞানশিক্ষালাভে যাহাতে বঞ্চিত না হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের মনে রাখা উচিত যে রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশন না থাকিলে মাইকেল ফ্যারাডের অভ্যুদয় সম্ভব হইত না। স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এই অভাবটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বসাধারণ যাহাতে বিজ্ঞানের বক্তৃতাদি শ্রবণ করিলা জ্ঞানলাভ করিতে পারে তাহার জন্য "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর্ দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স" নামক বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, কিন্তু ভরসা আছে কালক্রমে উহার সার্থকতা বর্দ্ধিত হইবে।

যে দিন মাইকেল ফ্যারাডে একখানি খাতা হাতে করিয়া রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনে ডেভীর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন, সে দিবস ফ্যারাডে ও রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশন—এই দুইয়ের—জীবনের একটি স্মরণীয় দিবস। রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনের সহিত সম্পর্ক ফ্যারাডের সমগ্র জীবনে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই, এবং ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযশ রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনকে সমগ্র ইউরোপে পরিচিত করিয়া দিয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত ডেভী ও ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাবলী ঐখানে সযত্নে রক্ষিত আছে বলিয়া রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে পরম পুণ্যময় তীর্থস্থান বলিয়া পরিচিত।

ডেভী তখন নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য বিশ্ববিখ্যাত

হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফ্যারাডের মতন তিনিও খুব হীনাবস্থা হইতে পরে স্বীয় প্রতিভার গুণে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালের অন্তঃপাতি পেন্‌জান্স
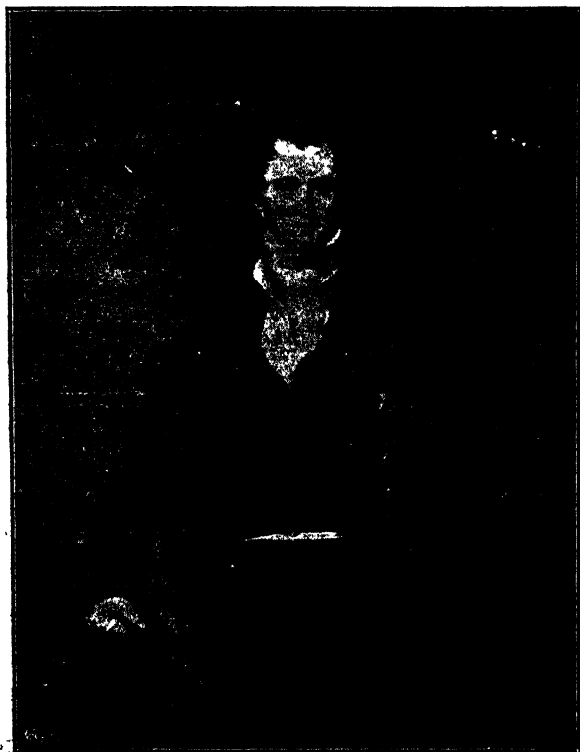
সার হাম্‌ফ্রি ডেভী

নামক স্থানে ডেভীর জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি এক ডাক্তারখানায় শিক্ষানবিশী করিতেন এবং সেই অল্প বয়সেই মদের গেলাস,

পুরাতন ঔষধের শিশি, তামাকের নল এবং পিচকারি লইয়া নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেন। কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ডাক্তার বেডোজ নামক একজন চিকিৎসকের সহকারী নিযুক্ত হন। এই সময়ে ডেভী, নাইট্রস্ অক্সাইড (nitrous oxidc) নামক গ্যাস লইয়া পরীক্ষায় নিযুক্ত হন। পূর্ব্বে এই গ্যাস অত্যন্ত বিষাক্ত বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল। তিনি সাহস করিয়া নিজ শরীরে ঐ গ্যাসের ক্রিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য ঐ গ্যাস শুঁকিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন, কিন্তু অজ্ঞানাবস্থায় তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, তিনি যেন অমরাবতীতে সুখে বিচরণ করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে খুব হাসিতে ছিলেন। খানিক পরে তিনি সুস্থাবস্থায় আবার উঠিয়া বসিলেন—তখন শরীরে আর কিছুমাত্র গ্লানি নাই। সেই অবধি এই গ্যাস "হাস্যোদ্দীপক গ্যাস" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই অদ্ভূত গ্যাসের স্বরূপ আবিষ্কারের পর ডেভীর নাম বৈজ্ঞানিক সমাজে পরিচিত হইল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশন্ স্থাপিত হয় এবং কাউণ্ট রমফোর্ড (Count Rumford) তাঁহাকে ঐখানে সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। সেখানে তিনি দিন দিন নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তড়িতের সাহায্যে কষ্টিক পটাশ (caustic potash) এবং কষ্টিক সোডা (caustic soda) নামক তীক্ষ্ণ ক্ষারদ্বয়কে বিশ্লিষ্ট করিয়া পোটাসিয়াম (potassium) এবং সোডিয়াম (Sodium) নামক দুইটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করেন। ঐ উপায়ে মেগ্‌নিসিয়াম (magnesium) বেরিয়ম (barium) কেলসিয়াম (calciun) ও ষ্ট্রন্‌সিয়াম (strontium) নামক

আরও চারিটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করেন। কিন্তু এক হিসাবে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—সেফ্‌টি ল্যাম্প (safety lamp)। পূর্ব্বে কয়লার খনিতে নানাপ্রকার দাহ্য গ্যাস থাকাতে তথায় কোনরূপ আলোক লইয়া যাওয়া বিপদজনক ছিল। ডেভী তাঁহার নূতন প্রদীপ আবিষ্কার করিয়া খনির কার্য্যে নিযুক্ত সহস্র সহস্র মানবের প্রাণরক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

ডেভীর বক্তৃতা করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য দলে দলে পুরুষ ও মহিলা সমাগত হইতেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিখ্যাত অধ্যাপকগণের বক্তৃতার বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা নিজ নিজ আবিষ্কারের বিষয়ই বক্তৃতা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে মৌলিক গবেষণার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরাতনেরই আলোচনা হইয়া থাকে, নূতনের সন্ধান শ্রোতৃবর্গ পান না। এই পার্থক্যের ফল স্বভাবতই পৃথক্ হইয়া পড়ে। একদিকে যেমন কেবল চর্ব্বিতের চর্ব্বণ, অধীতবিদ্যার অধ্যাপনা হইয়া থাকে, অপরদিকে নব নব তথ্য আবিষ্কারের জ্বলন্তকাহিনীর অনিবার্য্য আকর্ষণ শ্রোতৃবর্গের মনে নব অনুরাগ জাগাইয়া তোলে। এক-দিকে রাশি রাশি "পুস্তকস্থ বিদ্যার" কণ্ঠস্থকরণ ভিন্ন অন্য সুফল দৃষ্ট হয় না, অপর দিকে বক্তার আদর্শের অনুকরণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্বতই শ্রোতৃবৃন্দকে আকুল করিয়া দেয়। ফ্যারাডে গ্যালারীর এককোণে বসিয়া একমনে ডেভীর স্বকীয় আবিষ্কারের ভাবভঙ্গিমাময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। ক্রমে ক্রমে ডেভীর বৈজ্ঞানিক আদর্শ তাঁহার মনেও জাগিতে লাগিল। দপ্তরির কাজ আর তাঁহার ভাল লাগিল না। কেমন করিয়া তিনি দপ্তরির

কাজ ছাড়িয়া অতি দীনভাবেও বিজ্ঞানের সেবা করিতে পারিবেন এখন হইতে সেই চিন্তাই তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল।

তাঁহার বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শুনিবার ইচ্ছা এতই প্রবল ছিল যে, তিনি প্রত্যেক বক্তৃতার জন্য এক শিলিং খরচ করিয়াও ৪৩ নম্বর ডরসেট ষ্ট্রীটস্থ মিষ্টার টটমের বাটীতে রাত্রি আটটার সময় বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। তাঁহার নিজের পয়সা ছিল না, তাঁহার ভ্রাতা রবার্ট এই সকল বক্তৃতা শুনিবার খরচ দিতেন। তিনি এই সকল বক্তৃতা কেবল শ্রবণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, তাহাদের সারমর্ম্ম খাতায় লিখিয়া লইতেন এবং প্রদর্শিত যন্ত্রাদির চিত্রও অঙ্কিত করিতেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তাঁহার রিবোর নিকট শিক্ষানবিশী শেষ হইল। তাহার পর তিনি নিজের নামে দপ্তরির ব্যবসা খুলিলেন। দিন কতক এইরূপে কাজ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার শিক্ষানবিশীর সময় বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য যতটা সময় পাইতেন এখন আর তাহা পান না। অতএব এখন হইতে দৃঢ়সংকল্প করিলেন যে যেমন করিয়া হউক এই দপ্তরির কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে। ইতিপূর্ব্বে তিনি রয়েল সোসাইটি নামক ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভার সভাপতি সার জোসেফ ব্যাঙ্কস্‌কে স্বকীয় বিজ্ঞানচর্চ্চার ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তথায় একটি চাকরির জন্য একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার এই দুঃসাহসের কি আর উত্তর দিবেন। এখন তিনি আবার সার হাম্‌ফ্রী ডেভীকে একখানি পত্র লিখিতে মনস্থ করিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"এই সময়ে আমার কর্ম্ম

পরিত্যাগ ও বিজ্ঞানের সেবা করিবার ইচ্ছা এত বলবতী হইয়া উঠিল যে আমি সাহসে ভর করিয়া সার হাম্‌ফ্রী ডেভীকে একখানি পত্র লিখিলাম। আমার ধারণা জন্মিয়াছিল যে আমার নিজের কর্ম্ম নীচ ও স্বার্থপরতাপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিকগণ সদাশয় ও মহৎব্যক্তি। ঐ পত্রে আমি তাঁহাকে লিখিলাম যে যদি সুবিধা হয় তাহা হইলে তিনি আমাকে একটি চাকরী দিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। চিঠির সঙ্গে তাঁহার বক্তৃতা যে খাতায় লিখিয়া লইয়াছিলাম তাহাও পাঠাইয়া দিলাম।" ডেভী ফ্যারাডের খাতাখানি পড়িয়া তাঁহার পরিচয় নিশ্চয়ই পাইয়াছিলেন। ডেভী উত্তরে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন।

মহাশয়,

আপনি আমার উপর বিশ্বাসের যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে আমি আদৌ অসন্তুষ্ট নহি এবং আমি উহাতে আপনার ঐকান্তিক আগ্রহ, প্রভূত স্মৃতিশক্তি ও মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি। আমি সম্প্রতি সহরের বাহিরে যাইতেছি এবং সহরে ফিরিতে নাগাদ জানুয়ারী মাস হইবে। ফিরিয়া আসিলে আপনি যখন ইচ্ছা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। আমি যথাসাধ্য আপনার উপকার করিতে পারিলে আনন্দিত হইব। ইতি ভবদীয়—হম্‌ফ্রী ডেভী।

ডেভীর এই উত্তরে ফ্যারাডের কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল এক দিবস রাত্রে ফ্যারাডে ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময়ে বাটীর দরজায় জোরে ধাক্কার শব্দ পাইলেন। দরজা খুলিবামাত্র একজন ভৃত্য একখানি পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া গেল। পত্রখানি

খুলিয়া দেখেন যে উহা ডেভীর লিখিত—রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনে একজন সহকারীর পদ খালি আছে, ফ্যারাডের মনের যদি পরিবর্ত্তন না হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ পদ তাঁহার হইতে পারে। তিনি এইরূপে তাঁহার চিরইপ্সিত বিজ্ঞানসেবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া সানন্দে ঐ পদের জন্য প্রার্থী হইলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ্চ মাসের রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনের পরিচাকলকগণের সভার কার্য্যবিবরণীতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত বলিয়া লিপিবদ্ধ আছে "সার হাম্‌ফ্রী ডেভী ইন্‌ষ্টিটিউশনের পরিচালবর্গকে জানাইয়াছেন যে তিনি এক ব্যক্তির সন্ধান পাইয়াছেন, যিনি উইলিয়ম পেনের পরিত্যক্ত পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। ইঁহার নাম মাইকেল ফ্যারাডে। তাঁহার বয়স বাইস বৎসর, তাঁহাকে সৎস্বভাবসম্পন্ন, কর্ম্মঠ, প্রফুল্লচিত্ত এবং বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। মিষ্টার পেন্ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার সময় যে বেতন পাইতেন ইনি সেই বেতনেই কর্ম্ম করিতে রাজী আছেন।

অতএব স্থিরীকৃত হইল যে মাইকেল ফ্যারাডে মিষ্টার পেনের পদে সেই বেতনে নিযুক্ত হইলেন।"

"যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—ফ্যারাডে এতদিন যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই পাইলেন। তিনি সপ্তাহে পঁচিশ শিলিং বেতনে রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনে সহকারীর পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং থাকিবার জন্য উপরতলায় দুইটি ঘরও পাইলেন।

ইউরোপ ভ্রমণ।

ফ্যারাডে আগ্রহ সহকারে নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ডেভী এই সময়ে নাইট্রোজেন ক্লোরাইড নামক একটি

অতি ভয়ানক বিস্ফোরক পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। একটু অসাবধান হইলে হয়ত যন্ত্র ফাটিয়া গিয়া প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা, এক্ষেত্রে ডেভী ফ্যারাডেকে সহকারী করিয়া লওয়াতে বেশ বুঝা যায় যে তিনি ফ্যারাডের দক্ষতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনে কাচের বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া এই বিস্ফোরক পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিতেন, এবং কোনও রূপ বিপদ না হওয়াতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে ফ্যারাডে খুব সতর্কতা ও দক্ষতাসহকারে তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা করিয়াছিলেন।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেভী ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইবার ইচ্ছা করিলেন এবং ফ্যারাডেকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। নানা দেশের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণের সহিত সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা, তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিবার সুবিধা, তাঁহাদের বিজ্ঞানাগার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ফ্যারাডে ছাড়িতে পারিলেন না। শুধু পুস্তক পাঠে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, তাই ইউরোপের কৃতী ছাত্রবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পর সমস্ত ইউরোপের প্রথিত-যশা অধ্যাপকগণের বিজ্ঞানাগারে কয়েক বৎসর কাজ করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া থাকেন। মহতের সংস্পর্শে যে পুণ্যের সঞ্চয় হয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় এবং কার্য্যপ্রণালীতে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি, একটা উত্তেজনার ভাব আছে, যে তাহার সংস্পর্শে আসিয়া শিক্ষার্থীও তদীয় ভাবে অনুপ্রাণিত না হইয়া থাকিতে পারে না। তাই ফ্যারাডের এই ইউরোপ ভ্রমণ প্রকৃত শিক্ষার কার্য্য করিয়াছিল।

যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। ডেভীর সঙ্গে তাঁহার পত্নী, ফ্যারাডে ও একজন ভৃত্য যাইবার কথা ছিল; কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে ভৃত্যটি বাটী ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকৃত হইল। ফ্যারাডের ডেভীর সহকারীরূপেই যাইবার কথা ছিল, কিন্তু সঙ্গে ভৃত্য না যাওয়াতে তাঁহাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভৃত্যের কাজও কিছু কিছু করিতে হইত। ফ্যারাডে ইউরোপ ভ্রমণকালে একখানি খাতায় ভ্রমণসম্বন্ধে স্মরণীয় ঘটনাগুলি লিখিয়া রাখিতেন। তাহা পাঠে জানা যায় যে ইয়োরোপপ্রবাস তাঁহার পক্ষে নিতান্ত সুখের হয় নাই। বিশেষতঃ ডেভীপত্নী তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব দেখাইবার জন্য তাঁহাকে নানারূপ নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি এ সকলই সহ্য করিয়া দেড় বৎসরকাল ইউরোপে নানা দেশদর্শন ও অনেক বৈজ্ঞানিকের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মানব প্রকৃতি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অশেষ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথমে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরে অনেক ফরাসী বৈজ্ঞানিকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। এক দিবস আম্‌পিয়ার, ক্লিমেণ্ট ও ডেসরমে নবাবিষ্কৃত "আইওডিন" নামক মৌলিক পদার্থ ডেভীকে দেখাইতে আনিয়াছিলেন। ডেভী প্যারিসে উহা লইয়া কতকগুলি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তথায় তিন মাস অতিবাহিত করিয়া সকলে ইটালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের গাড়ী পঁয়ষট্টি জন বাহকের দ্বারা আল্‌পস পর্ব্বতের উপর দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। প্রথমে সকলে টিউরিন সহরে পঁহুছিলেন, সেখান হইতে জেনেভা যাত্রা করিলেন। জেনেভাতে চলনশীল তড়িতের (Current electricity) আবিষ্কর্ত্তা বয়ঃ

ও জ্ঞানবৃদ্ধ ভল্টার (Volta) সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। এইখানে আর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডিলা রাইভের (De La Rive) সহিত ফ্যারাডের পরিচয় হয়। তিনি ফ্যারাডের গুণের এত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন যে এক দিন ডেভী ও ফ্যারাডে উভয়কেই তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ডেভী এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, কারণ ফ্যারাডে যখন কোন কোন বিষয়ে তাঁহার ভৃত্যের কার্য্য করিতেন তখন তাঁহার সহিত একসঙ্গে তিনি আহার করিতে পারেন না। ডিলা রাইভ এই উত্তরে দুঃখিত হইয়া বলিলেন "তাহা হইলে আমাকে একটি ভোজের পরিবর্ত্তে দুইটি ভোজ দিতে হইবে"। ফ্যারাডে তাঁহার এই সৌজন্য কখনও বিস্মৃত হন নাই, তাঁহার স্মৃতি চিরজীবন তিনি বহন করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ডিলা রাইভের পুত্রকে ফ্যারাডে লিখিয়াছিলেন "আপনার পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ আছি। তিনি স্বয়ং জেনেভাতে, এবং পরে চিঠিপত্রে আমাকে উৎসাহিত এমন কি সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিলেন"।

জেনেভা হইতে ডেভী সদলে ফ্লরেন্স্ সহরে উপস্থিত হইলেন। এখানে ফ্যারাডে সবিস্ময়ে গ্যালিলিও (Gallelio) কর্ত্তৃক ব্যবহৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র দেখিলেন। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে পুণ্যশ্লোক গ্যালিলিও নৈশগগনের তারকামণ্ডলীর সহিত রজনীতে সখ্যতা স্থাপন করিতেন। গ্যালিলিও বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রচারের জন্য রাজদ্বারে সবিশেষ নিগৃহীত হইয়াছিলেন কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্র অতি সযত্নে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছেন।

ফ্লরেন্সে প্রায় এক মাসকাল অতিবাহিত করিয়া সকলে রোম নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে নেপল্‌স্ সহর দেখিয়া ভিসুভিয়াস নামক আগ্নেয়গিরি দর্শন করিতে গেলেন। তাহার পরে ইটালী পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় জেনেভাতে পঁহুছিলেন; তথা হইতে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ফ্যারাডে ফিরিয়া আসিয়া আবার রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসনে কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুরু ডেভীর সহিত হাতে কলমে কাজ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে ডেভীর ন্যায় বৈজ্ঞানিক হইবার আকাঙ্ক্ষা অল্পে অল্পে তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। বাস্তবিক উপযুক্ত গুরু লাভ না হইলে সাধনার পথ সুগম হয় না—তাই দেখি প্রহ্লাদের গুরু নারদ, শিবাজীর গুরু রামদাস, বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ, মাইকেলের গুরু মিল্‌টন, আর ফ্যারাডের গুরু ডেভী। এখন হইতে ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক জীবন আরম্ভ হইল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারী তিনি "সিটি ফিলজফিক্যাল" সোসাইটিতে তাঁহার প্রথম বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেন। ঐ বৎসরই তাঁহার প্রথম মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতক্ষণ আমরা ফ্যারাডের প্রতিভা কিরূপে ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারই পরিচয় দিলাম। তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া তাঁহার কথা শেষ করিব।

বিবিধ গ্যাসকে তরলীকরণ।

(Liquefaction of gases)

ফ্যারাডে একধারে রাসায়নিক ও পদার্থতত্ত্ববিৎ ছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ১৮১৬ সালে তাঁহার প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি তত মূল্যবান নয়, উহাতে টস্‌কানীদেশজাত চূণের একটি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ১৮১৬ সাল হইতে ১৮২০ সাল পর্য্যন্ত—এই চারি বৎসরে—ফ্যারাডে সাঁইত্রিশখানি মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ফ্যারাডে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন তাহা তখনও আরম্ভ হয় নাই।

অনেকে তরল বায়ুর (liquid air) কথা শুনিয়া থাকিবেন। এখানে আমরা চর্ম্মচক্ষে এখনও তরল বায়ু দেখি নাই, কিন্তু বিলাতে তরল বায়ু বিজ্ঞানাগার সমূহে বোতল বোতল ব্যবহৃত হয়। সাধারণ বায়ুকে খুব বেশী চাপ (pressure) দিলে ও প্রায়-২০০ ডিগ্রিতে ঠাণ্ডা করিলে বায়ু জলের মত তরল হইয়া যায়। উহা এত ঠাণ্ডা যে এক ফোঁটা হাতে পড়িলে হাতে ফোস্কা উঠে। ফ্যারাডে অবশ্য তরল বায়ু আবিষ্কার করেন নাই, কিন্তু উহার প্রস্তুতপ্রণালীর পন্থা সুগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম নানাবিধ গ্যাসকে তরল করিবার পন্থা আবিষ্কার করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়ে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উহাতে ক্লোরিন নামক গ্যাসকে তরল করিবার প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়। তিনি একটি কাঁচনলের এক মুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে ক্লোরিন

হাইড্রেট (chlorine hydrate) নামক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পরে অপর মুখটি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পরে যে মুখটিতে ক্লোরিন হাইড্রেট ছিল, সেই মুখে অল্প অল্প উত্তাপ প্রদান ও অপর মুখটি বরফে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পরে দেখিলেন যে, খালি মুখে খানিকটা পীত তৈলের মত তরল পদার্থ জমিয়াছে। তাঁহার আগে নর্থমোর নামে একজন রাসায়নিক এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফ্যারাডে এই তরল পদার্থের স্বরূপ সম্যক অবধারিত করিয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা স্থির করেন যে, এই তরল পদার্থ তরলীভূত ক্লোরিন গ্যাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ পরীক্ষায় তিনি দেখিতে পাইলেন যে কোনও গ্যাসকে তরলীভূত করিবার জন্য দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন —(১) অত্যধিক চাপ ও (২) অত্যধিক ঠাণ্ডা। বদ্ধ কাচনলের ভিতর ক্লোরিন হাইড্রেট উত্তপ্ত হওয়ার সময় প্রথমে ক্লোরিন গ্যাস বহির্গত হয়, কিন্তু উহা বাহির হইতে না পারায় স্বতই প্রভূত চাপ উৎপাদন করে এবং বরফের দ্বারা ঠাণ্ডা করায় উহা তরল আকারে পরিণত হইয়া থাকে।

ক্রমে এইরূপ উপায়ে তিনি আরও অনেকগুলি গ্যাস তরল করিয়া ফেলেন—সালফার ডাইঅক্সাইড (Sulphur dioxide) এমোনিয়া, (Ammonia) সাইয়ানোজেন (Cyanogen) প্রভৃতি। কিছুকাল পরে ফ্যারাডে একটি ছোট পম্পের সাহায্যে চাপ বৃদ্ধি করিয়া ও বরফের সহিত লবণ ও অন্যান্য দ্রব্য মিলাইয়া শীতলতা বৃদ্ধি করিয়া কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস (Carbonic acid gas), হাইড্রোক্লোরিক এসিড গ্যাস (Hydrocloric acid gas) ও হাস্যোদ্দীপক গ্যাস (nitrous oxide)

তরল অবস্থায় আনিতে সক্ষম হইলেন। এইরূপে সেই সময়ে জানিত প্রায় তাবৎ গ্যাসই ফ্যারাডের হস্তে তরলতা প্রাপ্ত হইল। বাকি রহিল কেবল ছয়টি গ্যাস—অম্লজান, উদ্‌জান, নেত্রজান, কার্ব্বন মনক্‌সাইড্ (Carbon monoxide), মার্স গ্যাস (marsh gas) এবং নাইট্রিক অক্‌সাইড (nitric oxide)। অনেক দিবস পর্য্যন্ত কেহই এই কয়েকটি গ্যাসকে তরল করিতে সক্ষম হন নাই এবং উহারা "চিরস্থায়ী গ্যাস" (permanent gas) নামে অভিহিত হইত। যে কার্য্য ফ্যারাডে আরম্ভ করিয়াছিলেন বহুদিন পরে তাহার সমাপ্তি হইয়াছে। এখন চাপ ও ঠাণ্ডা বৃদ্ধি করিবার জন্য বড় বড় যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সাহায্যে এই "চিরস্থায়ী গ্যাস"গুলিও তরলীভূত হইয়াছে। পিক্‌টে, ক্যালিটে, রোব্লাস্‌কি, ওলসেস্‌কি, ডেয়োয়ার, লিণ্ডে, হ্যামসন প্রভৃতি ইংরাজ, ফরাসী, রুসীয় ও আমেরিকান রাসায়নিকগণের জীবনব্যাপী চেষ্টায় ফ্যারাডের আরদ্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বেঞ্জিন আবিষ্কার।

ফ্যারাডের অন্যতম রাসায়নিক আবিষ্কার—বেঞ্জিন (benzene)। "পোরটেবল গ্যাস কোম্পানী"র দ্বারা তৈল হইতে প্রস্তুত গ্যাস পরীক্ষা কালে তিনি এই তরল পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রত্যেক রসায়ন শাস্ত্রের ছাত্র জানেন যে এই বেঞ্জিন হইতে জৈব (organic) রসায়নের এক নূতন বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী কালে এই বেঞ্জিন হইতে অসংখ্য জৈব

পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাজারে আজ কাল খুনখারাপি প্রভৃতি বিবিধ ও বিচিত্র বর্ণের যে শত শত রং পাওয়া যায় তাহার সকলগুলিই এই বেঞ্জিন হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত।
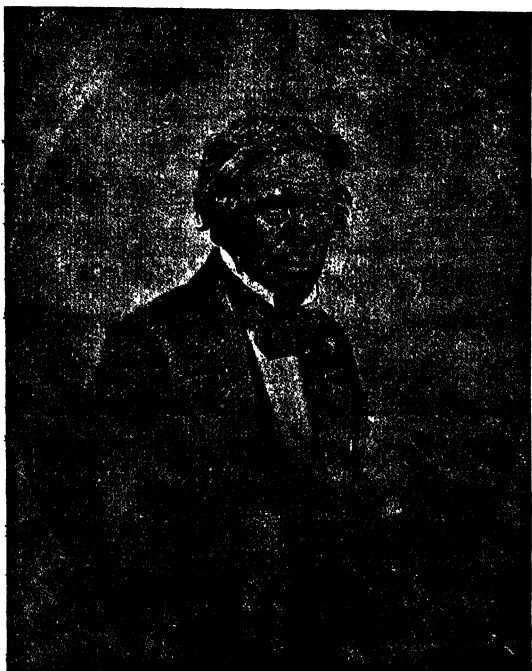
মাইকেল ফ্যারাডে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করিতেছি। ফ্যারাডে যখন ক্লোরিন প্রভৃতি গ্যাসকে তরলীভূত করিতেছিলেন তখন তাঁহার কোন কোনও বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন "এ কাজে পৃথিবীর কি উপকার হইবে? যে কাজে পৃথিবীর কোনও

উপকার হইবে না, তাহাতে সময় নষ্ট করা উচিত নহে।" এরূপ প্রশ্ন এখনও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস যে বিশুদ্ধ রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে গবেষণার কোন প্রয়োজন নাই, বরঞ্চ তাহা অপেক্ষা ঘটি, বাটি, ছাতা, জুতা, কাঁচ, কাগজ প্রভৃতি "প্রয়োজনীয়" দ্রব্য যাহাতে এদেশে উৎপন্ন হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত।

বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্ক্‌লিন এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেন "ছেলে মানুষ করিয়া কি লাভ?" যাঁহারা এরূপ প্রশ্ন করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বিশুদ্ধ রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার উন্নতি না হইলে এই সকল "প্রয়োজনীয়" দ্রব্যের প্রস্তুতপ্রক্রিয়ার আবিষ্কারের আদৌ সম্ভাবনা ছিল না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনেকটা নিষ্কাম সাধনার মত। আরব্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পৃথিবীর কোন কাজে আসিবে কি না—এ চিন্তা করিবার অবসর বৈজ্ঞানিকের নাই। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বৈজ্ঞানিকের গবেষণার উপর পৃথিবীর তাবৎ "প্রয়োজনীয়" দ্রব্যের উৎপত্তি নির্ভর করিতেছে। ফ্যারাডে যখন এতটুকু তরল ক্লোরিন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন কি তিনি ভাবিয়াছিলেন যে পরবর্তী কালে তাঁহার প্রস্তুত তরল ক্লোরিন শত সহস্র বোতল স্বর্ণের খনিতে ব্যবহৃত হইবে? ফ্যারাডের দূরদৃষ্টি কখনও দেখিতে পায় নাই যে তাঁহার আবিষ্কৃত বেঞ্জিন হইতে তাঁহার ভবিষ্যৎবংশীয়েরা বিচিত্র বর্ণের শত শত প্রকার রং প্রস্তুত করিবে। ফ্যারাডের বৈদ্যুতিক গবেষণা পাঠ করিয়া কে বলিতে পারিত যে তাঁহারই গবেষণার ফলস্বরূপ আজ বিশ্বে বিদ্যুৎ একটি পরমা শক্তিরূপে বিরাজ করিবে?

বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আবিষ্কার।

আজ বিদ্যুৎ যে সভ্যজগতে একটা প্রধান শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছে, মানবের উন্নত বুদ্ধিকৌশলের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া আজ তড়িৎ "নিরন্তর ভৃত্যভাবে" পাখা টানিতেছে, আলোক জ্বালিতেছ, ট্রামগাড়ী চালাইতেছ, বড় বড় কল যন্ত্রাদি সবেগে ঘুরাইতেছে—বিদ্যুৎকে মানবের এত কাজে লাগাইবার জন্য যে সকল বৈজ্ঞানিক আজীবন পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মাইকেল ফ্যারাডের স্থান খুব উচ্চে। তিনি এই সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্ম্মাণের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার পরবর্ত্তীকালের বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল মূল সূত্র যন্ত্রনির্ম্মাণকার্য্যে লাগাইয়া কত বিচিত্র যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছেন। যখন বৈদ্যুতিক আলোকোদ্ভাসিত হর্ম্ম্য-রাজিমধ্যে বৈদ্যুতিক পাখাসঞ্চালিত বায়ু সেবনে সুখানুভব করিবেন তখনই আপনারা একবার কামারসন্তান মাইকেল ফ্যারাডেকে স্মরণ করিবেন—তিনিই যাবতীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্ম্মাণের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করিয়া গিয়া আপনাদের চিত্ত-বিনোদনের উপায় করিয়া দিয়াছেন।

ফ্যারাডে যখন দপ্তরির কাজ করিতেছিলেন, তখন হইতেই তিনি বিদ্যুৎ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেন। সাত খণ্ড দস্তা ও সাত-খানি আধপেনী লইয়া তাহাদের মধ্যে লবণের জলে সিক্ত বস্ত্রখণ্ড দিয়া তিনি ভল্টার বৈদ্যুতিক ঘট (Voltaic pile) প্রস্তুত করিয়া নানাবিধ পরীক্ষা করিতেন। রয়েল ইনিস্‌টিটিউশনে ডেভীর সহিত তিনি বৈদ্যুতিক পরীক্ষা করিয়া বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বহুবিধ

অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ক্রমে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনা তাঁহার জীবনের একমাত্র সার সম্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার বৈদ্যুতিক সমস্ত আবিষ্কারের পরিচয় দিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়, এখানে আমরা কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিব মাত্র।

বিদ্যুৎ ও চুম্বকের দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন।

(Induction.)

বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা ফ্যারাডের পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অষ্টার্ড ও আমপিয়ার অনেক পরীক্ষা করিয়া বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা স্থির করিয়াছিলেন। ফ্যারাডের পূর্ব্বে জানা ছিল যে একটা লৌহ শলাকার উপর তামার তার জড়াইয়া সেই তারের ভিতর তড়িৎ প্রবাহ (electric current) চালনা করিলে লৌহটি চুম্বকে পরিণত হয়। সেইরূপ বৈদ্যুতিক প্রবাহসংযুক্ত একটি তামার তারের নিকটস্থ অপর একটি তামার তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপাদন করা যায় কি না ফ্যারাডে তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে দশ দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে প্রায় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ফ্যারাডে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

প্রথম। ফ্যারাডে রেশমের সূতার দ্বারা জড়ান তামার তার জড়াইয়া সূতার কাটিমের মত একটা বেষ্টন (coil) প্রস্তুত করিলেন। তারের দুইটি মুখে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করিবার জন্য একটি বৈদ্যুতিক কোষের (electric cell) সহিত যুক্ত করিয়া

দিলেন। পূর্ব্বোক্ত তারের কাটিমের উপর আর একটি তারের বেষ্টন প্রস্তুত করিয়া উহার দুইটি মুখ একটি বিদ্যুৎশক্তিপরিমাপক যন্ত্রের (galvanometer) সহিত লাগাইয়া দিলেন। তাহার পর ভিতরকার বেষ্টনের মধ্যে যেমন তড়িৎ প্রবাহ চালাইয়া দিলেন অমনি বাহিরের বেষ্টনের ভিতর বিপরীত দিকে একটি বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। আবার যথনই ভিতরকার বেষ্টনের তড়িৎ প্রবাহ থামাইয়া দিলেন তথনই বাহিরকার বেষ্টনের ভিতর দিয়া আর একটি তড়িৎ প্রবাহ প্রবাহিত হইল। এবারকার প্রবাহ প্রথম প্রবাহের বিপরীত দিকে। বিদ্যুৎশক্তিপরিমাপক যন্ত্রের লৌহশলাকার গতির দ্বারা প্রবাহের দিক নির্ণীত হইয়া থাকে। ভিতরকার বেষ্টনের মধ্যে ঠিক যে সময়ে তার খুলিয়া বা লাগাইয়া তড়িৎ প্রবাহ থামান বা চালান হয়, ঠিক সেই সময়েই বাহিরকার বেষ্টনে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু ভিতরকার বেষ্টনের মধ্যে যথন অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রবাহ চলিতে থাকে তথন বাহিরের বেষ্টনে তড়িৎ প্রবাহ চলে না।

দ্বিতীয়। বাহিরের বেষ্টনের মত আর একটি বেষ্টন প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর একখানা চুম্বকশলাকা প্রবেশ করাইয়াদিলেন। চুম্বক প্রবেশ করাইবা মাত্র একটি বিদ্যুৎ প্রবাহ বেষ্টনে প্রবাহিত হইতে দেখিতে পাইলেন। যতক্ষণ চুম্বক ভিতরে স্থির ছিল ততক্ষণ কোনও প্রবাহ লক্ষিত হইল না। আবার যথন চুম্বকশলাকাকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া লওয়া হইল তথনই অপর দিকে আর একটি প্রবাহ বেষ্টনে প্রবাহিত হইল। এইরূপে ফ্যারাডে বিদ্যুৎ ও চুম্বক উভয়ের দ্বারাই বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন।

তৃতীয়। ফ্যারাডে ইহাতে ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি

জানিতেন যে পৃথিবী একটি অতি বৃহৎ চুম্বকের কার্য্য করে, সেইজন্য সাধারণ চুম্বকের মুখ সতত উত্তর দিকে থাকে। তিনি ভাবিলেন যে যখন সাধারণ চুম্বক হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তখন পৃথিবী হইতেই বা কেন বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে না? সেইজন্য তিনি একটা তামার তারের বেষ্টন চুম্বকীয় সূচিপতনের (magnetic dip) ক্ষেত্রে রাখিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত বিদ্যুৎ-শক্তিপরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাইলেন যে বেষ্টনটি ঘুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বারেই একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বেষ্টনের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

চতুর্থ। ফ্যারাডে আরও দেখাইলেন যে কেবল একটা তড়িৎ প্রবাহ নিকটবর্ত্তী অপর একটি তামার তারে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করিতে পারে এমত নহে, যে তারের ভিতর দিয়া সেই প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে সেই তারেই একবার খুলিবার সময় ও একবার দিবার সময় দুইটি তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই প্রবাহের নাম দিলেন "একৃষ্ট্রা করেণ্ট" (extra current)।

ফ্যারাডের এই সকল আবিষ্কারের ফলে বিদ্যুৎজননের কতকগুলি নূতন উপায় উদ্‌ভাবিত হইল। তাঁহার পূর্ব্বে বিদ্যুৎকোষের (elcetric cell) দ্বারাই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইত, কিন্তু সেই সকল কোষে যে মূল্যবান দ্রব্যসকল ব্যবহৃত হইত, সেইগুলি দিনকতকের পর ফেলিয়া দেওয়া হইত বলিয়া বিদ্যুৎজনন অত্যন্ত মহার্ঘ ছিল। ফ্যারাডের এই সকল আবিষ্কারকে মূল সূত্র করিয়া অধুনা বৃহৎ বৃহৎ ডাইনামো প্রভৃতি বিদ্যুৎজননের যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এই সকল যন্ত্রজাত বিদ্যুতের সাহায্যে আলোক জ্বলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে, ট্রাম ও কল চলিতেছে।

বিদ্যুতের রাসায়নিক বিশ্লেষণের নিয়ম।
(Law of Electrolysis.)

বিদ্যুতের যে রাসায়নিক বিশ্লেষণের ক্ষমতা আছে তাহা ফ্যারাডে পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে নিকলসন এবং কার্লাইল নামক দুই ব্যক্তি তাড়িতপ্রবাহের দ্বারা জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া উদ্‌জান ও অম্লজান গ্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ডেভী তড়িৎপ্রবাহের দ্বারা কষ্টিক, সোডা ও পটাস নামক তীক্ষ্ণ ক্ষারদ্বয় বিশ্লিষ্ট করিয়া দুইটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ফ্যারাডে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্যের ভিতর তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিয়া বিবিধ পরীক্ষার পর একটি পরিমাণাত্মক নিয়ম (quantitative law) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইলেন যে সমপরিমাণ তড়িৎপ্রবাহের দ্বারা ১ ভাগ ওজনের উদ্‌জান, ৮ ভাগ অম্লজান, ৩৫·৫ ভাগ ক্লোরিন, ১০৩·৫ ভাগ সীসক, ১০৮ ভাগ রৌপ্য, ও ৬৫·৩ ভাগ স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন কথা হইতেছে যে এই ৮ ভাগ অম্লজান, ৩৫·৫ ভাগ ক্লোরিন, ১০৩·৫ ভাগ সীসক প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ ১ ভাগ ওজনের উদ্‌জানের সহিত রসায়নিকভাবে সংযুক্ত হইয়া থাকে। এই রাসায়নিক সংযোগের ওজনকে "তুল্য ওজন" (equivalent weight) বলে। সেইজন্য ফ্যারাডে তাঁহার নিয়ম নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিলেন—"সমপরিমাণ তড়িৎপ্রবাহ বিভিন্ন যৌগিক হইতে "তুল্য ওজনের" মূল পদার্থ বিশ্লিষ্ট করিয়া থাকে"। সোনা রূপার গিল্টি করার আধুনিক প্রক্রিয়া বিদ্যুতের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

চুম্বকত্ব ও পরাচুম্বকত্ব।

(Paramagnetism and diamagnetism.)

ফ্যারাডের একটি বিশিষ্ট আবিষ্কার দ্রব্যসমূহের চুম্বকত্ব ও অচুম্বকত্ব। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যারাডে দেখাইলেন যে যাবতীয় দ্রব্য সাধারণ চুম্বকের দ্বারা হয় আকৃষ্ট (attracted) হয়, না হয় বিতাড়িত (repelled) হয়। তিনি কঠিন তরল ও বায়বীয় এই তিনি প্রকার দ্রব্য লইয়াই পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইলেন যে ধাতু সকলের মধ্যে লৌহ, নিকেল, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, প্লাটিনাম প্রভৃতি ধাতু চুম্বকজাতীয় এবং দস্তা, টিন, পারদ, সীসক, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু পরাচুম্বক জাতীয়। ধাতু ভিন্ন নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সাধারণ চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়— অনেক প্রকারের কাগজ, গালা, গ্রেফাইট, ফ্লুরস্পার, কাঠের কয়লা ইত্যাদি এবং নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সাধারণ চুম্বকের দ্বারা বিতাড়িত (repelled) হয়—ফটকিরি, কাঁচ, চিনি, রুটি, গন্ধক ইত্যাদি। ফ্যারাডে তরল দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে কতকগুলি দ্রব্যের জলীয় দ্রব (solution) চুম্বকাত্মক, যথা—লৌহ ও কোবাল্‌ট ধাতুর যৌগিকসমূহ। অপর দিকে জল, রক্ত, দুগ্ধ, সুরা, তার্পিন, তৈল, ইথার প্রভৃতি তরল পদার্থ পরাচুম্বক-জাতীয়। তাহার পর তিনি বায়বীয় পদার্থের চুম্বকত্ব বা পরাচুম্বকত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে বাতির আলো চুম্বকের দ্বারা সজোরে বিতাড়িত হইয়া থাকে কিন্তু অম্লজান চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যাবতীয় দ্রব্যের চুম্বকত্ব বা পরাচুম্বকত্বের গুণ আবিষ্কার করিয়া ফ্যারাডে এক

নূতন শাস্ত্রের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। অম্লজানের চুম্বকত্বের দরুণ পৃথিবীর চুম্বকত্বের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া ফ্যারাডে প্রচার করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার নানাবিধ পরীক্ষা তাঁহাকে অদ্বিতীয় পরীক্ষাকুশল বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

ফ্যারাডের আরও অনেক মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হইয়াছে; বাহুল্যভয়ে সেগুলি পরিত্যক্ত হইল। বাস্তবিক এক নিউটন ভিন্ন অপর কোনও বৈজ্ঞানিক এতগুলি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন কি না সন্দেহের বিষয়। তিনি নিজে একখানি খাতা তৈয়ারি করিয়াছিলেন এবং সেই খাতায় যখন যে বিষয়ে কোনও প্রস্তাবনা মনে উদয় হইত তাহা লিখিয়া রাখিতেন। তিনি সকল বৈজ্ঞানিককে এইরূপ একখানি নোটবহি রাখিতে পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সুবিধা অনেক আছে। অদ্য হঠাৎ একটা বিষয়ে পরীক্ষা করিবার কথা মনে উদিত হইল, হয়ত কাজের ভিড়ে তাহা লিখিয়া না রাখার দরুণ ভুলিয়া যাইতে হইল। এইরূপ একখানি খাতা থাকিলে সেরূপ ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

তাঁহার শিক্ষাগুরু ডেভীর সহিত তাঁহার সদ্ভাব ক্রমেই কমিতে ছিল। ফ্যারাডে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা যতই খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছিলেন ততই ডেভী তাঁহাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এরূপ প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়—প্রথমে গুরুশিষ্যে বেশ হৃদ্যতা থাকে, পরে যখন প্রতিভাশালী শিষ্য স্বীয় প্রতিভার গুণে গুরুর সমকক্ষ হইয়া উঠেন তখন গুরুর আর শিষ্যের প্রতি পূর্ব্বভাব থাকে না; একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আসিয়া দেখা দেয়।

এক্ষেত্রেও ডেভীর অবস্থা কতকটা সেইরূপই দাঁড়াইয়াছিল। যখন ফ্যারাডের নাম বিখ্যাত রয়েল সোসাইটির সদস্যরূপে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তখন ডেভী উহার সভাপতিরূপে তাঁহাকে যথাসাধ্য বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে দিবস ভোট লওয়া হইয়াছিল, ব্যালট বাক্সে একটিমাত্র কালো বল দেখা গিয়াছিল; অবশ্য এই কালো বলটি কাহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা ফ্যারাডের বুঝিতে বাকি ছিল না। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে কোনও বৈজ্ঞানিক জীবিতকালে স্বদেশ ও বিদেশ হইতে ফ্যারাডের মত এত সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই—ফ্যারাডে সর্ব্বসমেত পঁচানব্বইটি সম্মানসূচক পদবী ও খেতাব লাভ করিয়াছিলেন।

ফ্যারাডের চরিত্র অতি পবিত্র এবং স্বভাব অতি মধুর ছিল। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি মিস সারা বার্ণাডকে বিবাহ করেন। বিবাহের আটাইশ বৎসর পরে তাঁহার খাতায় তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন "১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন আমি বিবাহ করিয়াছি—এই বিবাহ অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা আমাকে সমধিক মানসিক আনন্দ ও পার্থিব সুখ প্রদান করিয়াছে। আমাদের বিবাহবন্ধন আজ আটাইশ বৎসর চলিয়া আসিয়াছে, ইহার মধ্যে দাম্পত্য প্রণয়ের গাঢ়তা বৃদ্ধি ভিন্ন উহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই।" বিবাহের পর রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসনে আলাহিদা ঘর পাইয়াছিলেন; সেইখানেই সপরিবারে তিনি বাস করিতেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধান সচিব সার রবার্ট পিল ফ্যারাডেকে ৩০০ পাউণ্ড বাৎসরিক পেন্‌সন দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফ্যারাডে প্রথমে উহা লইতে রাজি হন নাই, কারণ তিনি বলিতেন যে স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জনের ক্ষমতা তাঁহার

তখনও ছিল। শেষে বন্ধুবান্ধবদিগের উপরোধে তিনি রাজি হইয়াছিলেন। সার রবার্ট পিলের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই লর্ড মেলবোর্ন প্রধান সচিবের পদ প্রাপ্ত হন। নূতন সচিব ফ্যারাডের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ফ্যারাডে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। লর্ড মেলবোর্ন ফ্যারাডেকে ঠিক চিনিতে পারেন নাই—ফ্যারাডের স্বভাব বালকের ন্যায় সরল হইলেও তাঁহার মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের দৃঢ়তা যথেষ্ট ছিল। প্রধান সচিবের কথাবার্ত্তায় ফ্যারাডে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন; লর্ড মেলবোর্ন কথাপ্রসঙ্গে খুব সম্ভবতঃ বলিয়াছিলেন যে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিকগণকে পেন্‌সন প্রদান করার প্রথাকে তিনি অর্থের অপব্যয় মনে করেন। ফ্যারাডে বাটী আসিয়াই লর্ড মেলবোর্নকে একখানি পত্র লিখেন—তাহাতে তিনি সেদিনকার কথাবার্ত্তায় নিজের বিরক্তি জ্ঞাপন করেন এবং প্রস্তাবিত পেন্‌সন গ্রহণে অনিচ্ছা-প্রকাশ করেন। পরে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার প্রয়াস পান। ফ্যারাডে তাঁহাকে বলেন যে যদি লর্ড মেলবোর্ন তাঁহার কথাবার্ত্তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখেন তাহা হইলে এ বিবাদ মিটিয়া যাইবে। লর্ড মেলবোর্ন এই সংবাদ পাইয়া আন্তরিক দুঃখ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ফ্যারাডেকে পত্র লিখেন এবং এইখানেই এই ব্যাপারের শেষ হয়। ফ্যারাডে জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার পেন্‌সন ভোগ করেন। এই ঘটনায় ফ্যারাডের উন্নত মনুষ্যত্বের পরিচয় বেশ সুস্পষ্ট-ভাবে পাওয়া যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয়া মহামান্যা সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স কন্‌সার্টের অনুরোধে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া হ্যাম্‌টন কোর্টে একখানি বাটী ফ্যারাডেকে বাস করিতে দেন।

এই বাটীতে তিনি জীবনের শেষকাল অতিবাহিত করেন। অত্যধিক মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২৫এ আগষ্ট তারিখে সাতাত্তর বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার পড়িবার ঘরে চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হন। তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে বিনা আড়ম্বরে তাঁহার সমাধি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং একখানি সামান্য সমাধিফলকে তাঁহার শেষ বিশ্রাম স্থানের পরিচয় ঘোষিত হইতেছে। অদ্য এই উন্নতচেতা, বালকবৎ চিরসরল, বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ ইংরাজের সমাধিফলকের উপর সুদূর বিদেশবাসী একজন ভক্ত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নিউটন।

যেমন শিব নটকুলচূড়ামণি, যেমন পর্ব্বতের মধ্যে হিমাদ্রি শ্রেষ্ঠ, যেমন তারকাসুন্দরীগণের মধ্যে রোহিণী বরণীয়া, যেমন "কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ" তেমনই বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে নিউটন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শুধু ইংরাজ কেন, পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য জাতি একবাক্যে নিউটনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের আসন প্রদান করিয়াছেন। অথচ এই আত্মাভিমানশূন্য কর্ম্মবীর মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছিলেন "আমি জানি না জগৎ আমার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কি মনে করিবে; কিন্তু আমার নিজের মনে হয় যে আমি জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসিয়া ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় প্রস্তরখণ্ড কুড়াইয়াছি মাত্র, আর বিশাল জ্ঞান-সমুদ্র সমস্তই অনাবিষ্কৃতভাবে আমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে।"

১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লিনকনসায়ারের মধ্যস্থ উলস্থর্প নামক গ্রামে নিউটনের জন্ম হয়। যিনি এককালে বিশ্বের 'আকর্ষণ' আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইবেন, তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার কালে এত ক্ষুদ্রকায় ছিলেন যে, তাঁহার মাতা বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার সন্তানকে একটা বোতলের মধ্যে অনায়াসে রাখিতে পারিতেন। ভূমিষ্ঠ শিশু এতই দুর্ব্বল ছিল যে দুইটী স্ত্রীলোক তাহার জন্য ভিন্ন গ্রামে ঔষধ আনিতে যাইবার কালে মনে করে নাই যে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া শিশুটিকে জীবন্ত দেখিতে

পাইবে। যাহা হউক, বিধাতা পৃথিবীর হিতের জন্য যাহাকে সৃজন করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনিই বাঁচাইয়া রাখিলেন।

নিউটনের জন্মের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মাতা পুনরায় বিবাহ করিলে তাঁহার মাতামহী তাঁহাকে লালনপালন করেন। বাল্যকালে নিউটন নিজ গ্রামের সন্নিকটস্থ এক স্কুলে পড়িতেন। লেখাপড়ায় বালক নিউটনের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত না, এবং ক্লাসে তিনি সকলের নীচে থাকিতেন। তবে অন্য বালকেরা যখন খেলা করিয়া বেড়াইত তখন নিউটন স্বহস্তে ছোট ছোট খেলনা প্রস্তুত করিয়া তাহা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। কখনও জলঘড়ি প্রস্তুত হইতেছে, কখনও একটা ইঁদুরকে ধরিয়া তাহার দ্বারা একটা ছোট কল চালান হইতেছে, আবার কখনও কখনও একটা ঘুড়ির লেজে একটা কাগজের লণ্ঠন বাঁধিয়া দেওয়া হইত, যেন গ্রামের লোকেরা দিনের বেলায় তারা দেখিতে পায়! এইরূপ ক্রীড়াকৌতুকেই তাঁহার বেশী আগ্রহ দেখা যাইত। একদিন উপর ক্লাসের একটি বেশী বয়সের ছেলে তাঁহাকে একটা লাথি মারে; নিউটন তাহার ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার সহিত মারামারি করেন। এই মারামারিতে তাঁহারই জয় হয়। মারামারিতে জয় লাভ করার পর হইতে লেখাপড়ায়ও অপর বালকদিগকে জয় করিবার জন্য তাঁহাকে সচেষ্ট দেখা যায়। ইহার পর হইতে নিউটন স্কুলের একজন ভাল ছেলে বলিয়া পরিগণিত হইলেন। যখন তাঁহার বয়স পনর বৎসর তখন তাঁহার মাতা পুনরায় বিধবা হইয়া উলস্‌থর্পে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনেন এবং চাষবাসের তত্ত্বাবধান কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু শীঘ্রই

দেখা গেল যে, চাষবাসের তত্ত্বাবধান তাঁহার দ্বারা ভালরূপই হইতেছে! প্রায়ই দেখা যাইত যে তিনি চাষবাসের তত্ত্বাবধান ফেলিয়া কোন বেড়ার বা ঝোপের ধারে বসিয়া বসিয়া অঙ্ক কসিতেছেন বা ছোট ছোট কল প্রস্তুত করিতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার এক মামা তাঁহার মাকে বলিয়া তাঁহাকে পুনরায় স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন এবং সেখান হইতে শীঘ্রই তিনি বিখ্যাত কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ট্রিনিটী কলেজে প্রেরিত হইলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করার পর হইতেই তাঁহার অন্তর্নিহিত ধীশক্তি বিকাশ লাভ করিতে থাকে। তিনি অনন্য-মনে অঙ্কশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই সতীর্থ যুবক-গণকে ঐ বিদ্যায় ছাড়াইয়া গেলেন। কলেজের পঠদ্দশাতেই তিনি অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন। একুশ বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি দ্বিপদ-সিদ্ধান্ত (binomial theorem) আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং শীঘ্রই শূন্যবৃদ্ধি-সিদ্ধান্ত (theory of fluxions) আবিষ্কার করিয়া ডিফারেন্সিয়াল ক্যাল্‌কুলাস্ (Differential calculus) নামক গণিতবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সকল আবিষ্কার করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, উহা প্রকাশ করিবার কল্পনা তাঁহার মনে আদৌ উদিত হয় নাই। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি, এ পাশ করিয়া একটি বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং তাহার পর বৎসর কেম্ব্রিজে প্লেগ হওয়াতে তিনি নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিশ্বাকর্ষণ আবিষ্কার।

কেম্ব্রিজ হইতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্ব হইতেই নিউটন জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। জ্যোতিষের একটা প্রশ্ন তাঁহাকে বড়ই চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই মনে মনে ভাবিতেন "আচ্ছা! চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে কেন? গ্রহ উপগ্রহগণই বা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? উহারা সোজা চলিয়া যায় না কেন? বৃত্তাকারে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? একটি গোল মার্ব্বেলকে একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর গড়াইয়া দিলে উহা বাতাস বা ক্ষেত্রের ঘর্ষণজনিত কোনও প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হইলে বরাবর সোজাই চলিতে থাকিবে। তবে গ্রহ উপগ্রহ সকল সোজা চলিয়া যায় না কেন? কোন্ শক্তি উহাদিগকে ঘুরাইতে থাকে?" তিনি ইহার কারণ কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এইরূপ মানসিক অবস্থা লইয়া প্লেগের বৎসরে তিনি স্বগ্রামে চলিয়া গেলেন। সেখানেও সেই চিন্তা। একদিন বাগানে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সম্মুখস্থ একটি বৃক্ষ হইতে একটি পক্ক আপেল ফল মাটিতে সশব্দে পড়িয়া গেল। তিনি উহা লক্ষ্য করিলেন, তখনই মনে মনে প্রশ্ন উঠিল, আপেল পড়ে কেন? মনে মনে তখনই উহার জবাবও মিলিল;—"পৃথিবী আপেলকে আকর্ষণ করে বলিয়াই আপেল মাটিতে পড়ে।" যেমন জলমগ্ন ব্যক্তি সম্মুখস্থ কাষ্ঠখণ্ড দর্শনে, অথবা অন্ধকার গৃহমধ্যস্থ বন্দী অপ্রত্যাশিত ক্ষীণ জ্যোৎস্না দর্শনে, যেরূপ পুলকিত হয়, নিউটনও এই অপ্রত্যাশিত মানসিক উত্তর পাইয়া সেইরূপ

আনন্দিত হইলেন। পৃথিবীর আকর্ষণ যে ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই এমন নহে। নিউটনের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের বৈজ্ঞানিকগণের উজ্জ্বল ভাস্কর ভাস্করাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।

আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে॥

অর্থাৎ "পৃথিবীর আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে; সেই শক্তির বলে শূন্যমার্গে প্রক্ষিপ্ত গুরু বস্তু পুনরায় পৃথিবী অভিমুখে আকৃষ্ট হয় বলিয়াই বস্তু সকল পতনশীল বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, আর পৃথিবীর চতুর্দ্দিকের আকাশ সমান হওয়াতে পৃথিবী আর কোথায় পড়িবে?" অতএব পৃথিবীর আকর্ষণ প্রাচীন কালে ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া ভারতবাসী গৌরব করিতে পারেন।

নিউটন এই পৃথিবীর আকর্ষণকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া উহা বিশ্বের আকর্ষণের অঙ্গীভূত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং এই বিশ্বাকর্ষণ সম্বন্ধে পরিমাণাত্মক নিয়মও (quantitative law) আবিষ্কার করিয়া সমগ্র জ্যোতিষশাস্ত্রকে এক অভিনব সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন।

নিউটন ভাবিলেন, যদি পৃথিবী ক্ষুদ্র আপেল ফলটিকে বা ঊর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত বস্তুমাত্রকেই টানিতে পারে তবে উহা পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র, চন্দ্রকে আকর্ষণ করিবে না কেন? পৃথিবী যদি চন্দ্রকে আকর্ষণ করে তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম জ্যোতিষ্ক সূর্য্য, পৃথিবী ও গ্রহনক্ষত্রবর্গকে আকর্ষণ করিবে না কেন? নিউটন ক্রমশঃ স্থির করিলেন যে এই বিশ্বাকর্ষণই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে শূন্যমার্গে বৃত্তাকারে ঘুরাইতেছে। পাঠকবর্গকে নিউটনের সিদ্ধান্ত সহজেই বুঝান যাইতে পারে। একখণ্ড দড়িতে

একটা ঢিল বাঁধিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঢিলটা সোজা চলিয়া যাইবে; কিন্তু ঘুরাইবার সময় হস্তসংলগ্ন দড়ির আকর্ষণে উহা বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে। প্রতি মুহূর্ত্তে ঢিলটির উপর দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে—একটি শক্তির দ্বারা উহা সোজা চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত ও অপরটি অর্থাৎ হস্তের আকর্ষণ উহার সোজা গতিকে প্রতিনিয়ত ফিরাইয়া দিতেছে। এইরূপে ঢিলটি হস্তের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াও হস্তের উপর পড়িতেছে না, বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে। সেইরূপ চন্দ্র কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে গতিশীল; উহা পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট না হইলে বরাবর সোজা চলিয়া যাইত; কিন্তু পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াতে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। সেইরূপ এই আকর্ষণের জন্য সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া উহাকে কেন্দ্র করিয়া অপর জ্যোতিষ্কমণ্ডলী উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে।

এইরূপে নিউটন মানসপথে ভ্রাম্যমান অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতির রহস্যময় চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। তিনি এই আকর্ষণ-শক্তি আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; তিনি আকর্ষণের পরিমাণ জানিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। বিখ্যাত জ্যোতিষী কেপ্‌লার নিউটনের পূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘবৃত্তাকারে (ellipse) চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। এইরূপ ভ্রমণকালে গ্রহগণ সূর্য্যের নিকটস্থ হইলে বা সূর্য্য হইতে দূরে অবস্থিতি করিলে আকর্ষণের কিরূপ বিভিন্নতা হয় তাহা নিউটন গণনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ গণনার ফলে দেখিতে পাইলেন যে সূর্য্য হইতে গ্রহগণ যতই দূরে

যায়, সূর্য্যের আকর্ষণ ততই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কমিতে থাকে। তিনি স্থির করিলেন যে এই আকর্ষণ, দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত ভাবে (invesrely as the square of the distance) কমিতে থাকে; যথা—দূরত্ব যদি দ্বিগুণ হয় আকর্ষণ চতুর্থাংশ হইয়া যাইবে, যদি তিনগুণ হয়, আকর্ষণ নবমাংশ হইবে ইত্যাদি।

বিশ্বের আকর্ষণ সম্বন্ধে এই পরিমাণাত্মক নিয়ম আবিষ্কার

নিউটন।

করিয়া তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত সঠিক কি না তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য চন্দ্রের গতি পৃথিবীর আকর্ষণের দ্বারা কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই গণনাতে পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর পরিধি পর্য্যন্ত দূরত্ব জানা আবশ্যক। কিন্তু তৎকালে পৃথিবীর পরিধি বা ব্যাস সঠিক জানা ছিল না। যাহা জানা ছিল তাহা লইয়া তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার গণনা ও পরীক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত চন্দ্রের গতি মিলিতেছে না;—চন্দ্রের পরীক্ষিত গতি তাঁহার গণনা অপেক্ষা কিছু বেশী হইয়াছে। তিনি এই অসামঞ্জস্য মিলাইতে না পারিয়া, কাগজ পত্র সমস্ত দেরাজের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। তাহার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন নাই বা কাহাকেও সে সম্বন্ধে কোন কথাও বলেন নাই। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে একদিন রয়েল সোসাইটির অধিবেশনে পিকার্ড নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকের একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি সঠিক-ভাবে পৃথিবীর পরিধি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত পরিধি প্রচলিত মাপ হইতে কিছু বেশী হইয়াছিল। নিউটন এই সংবাদ প্রথমে পান নাই। কয়েক বৎসর পরে এই সংবাদ পাইয়াই তিনি বাটী গিয়া পুরাতন কাগজপত্র বাহির করিয়া আবার গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার ঠিক মিলিয়া গেল। কথিত আছে যে, যখন তিনি অঙ্ক কসিতে কসিতে দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার গণনা মিলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে তখন তিনি আনন্দে এমনই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে গণনার শেষ ফল তিনি একজন বন্ধুকে কসিয়া দিবার জন্য

অনুরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার সুদীর্ঘ-কালব্যাপী সাধনা সফল হইয়াছিল ;—তিনি অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতির কারণ সঠিকরূপে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

"প্রিন্সিপিয়া" গ্রন্থ।

ইহার পর হইতে তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া অনন্যমনে বিশ্বাকর্ষণ-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; এবং তাঁহার গবেষণার ফল জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ "প্রিন্সিপিয়া" নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময় চিন্তায় এমনই নিমগ্ন থাকিতেন যে স্নানাহারের কথা অনেক দিন ভুলিয়াই যাইতেন। একদিন তাঁহার এক বন্ধু—ডাক্তার ষ্টুকলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে একটি টেবিলে নিউটনের জন্য খাবার ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে ; ডাক্তারটি কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে ভোজন সমাপ্ত করিয়া মুরগীর হাড়গুলি প্লেটে রাখিয়া দিয়া খাবার যেমন ঢাকা ছিল সেইরূপ ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিলেন ; তারপর নিউটন আসিয়া বন্ধুর সহিত আলাপ করিতে করিতে আহার করিতে বসিলে প্লেট খুলিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"অ্যাঁঃ! আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমি এঁখনও খাই নাই বুঝি, এখন দেখিতেছি আমার খাওয়া হইয়া গিয়াছে ত।" এইরূপ একাগ্রতা, এইরূপ অধ্যবসায় না থাকিলে "প্রিন্সিপিয়ার" ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ কখনও রচিত হইতে পারিত না। নবাবিষ্কৃত বিশ্বাকর্ষণের সিদ্ধান্ত হইতে বহু নূতন তথ্য অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে তিনি আবিষ্কার করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

ইংরাজের পরম দুর্ভাগ্য যে জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ইংরাজ কর্ত্তৃক লিখিত হইলেও ইংরাজি ভাষায় লিখিত হয় নাই—তখনকার প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ল্যাটিনভাষায় লিখিত হইয়াছিল। যখন এই মহাগ্রন্থের প্রথমভাগ সমাপ্ত হইল তখনও উহা প্রকাশ করিবার কল্পনা নিউটনের মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। তিনি প্রকৃত জ্ঞানেরই উপাসক ছিলেন, নামের উপাসক ছিলেন না। তাই তিনি লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলি একটা দেরাজে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন; ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার মৃত্যুর পর কেহ উহা প্রকাশ করিবে। কিন্তু ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ এডমণ্ড হ্যালে প্রিন্সিপিয়ার পাণ্ডুলিপি নিউটনের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন এবং ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজব্যয়ে উহা মুদ্রিত করেন। যখন উহা প্রকাশিত হইয়াছিল তখন বৈজ্ঞানিক সমাজে দশ বার জন লোকও উহা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সিপিয়ার এক নূতন সংস্করণ বাহির হয়, এই সংস্করণ আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান। এস্থলে এই মহাগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, সেইজন্য নিম্নে গুটিকতক বিষয়ের চুম্বকমাত্র প্রদত্ত হইল।

বিশ্বাকর্ষণের নিয়ম।—জড়জগতের প্রত্যেক অণু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই আকর্ষণ-শক্তি প্রত্যেক অণুর ভার অনুযায়ী ও দূরত্বের বর্গফলের বিপরীতানুযায়ী (varies directly as the mass and inversely as the square of the distance).

গতি নিয়মাবলী। (Laws of motion)—গেলিলিও গতিশীল বস্তু সম্বন্ধে যে তিনটি নিয়ম পরীক্ষার দ্বারা

আবিষ্কার করিয়াছিলেন, নিউটন সেগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করেন এবং তাহাদের বিশদ ব্যাখ্যা দেন। তিনি এই সকল নিয়মের সাহায্যে পতনশীল দ্রব্যের গতির নিয়ম গণনা করেন এবং তাহাদের পথের স্বরূপও নির্ণয় করেন।

কেপ্‌লারের আবিষ্কৃত নিয়মাবলী।—কেপলার জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর গতি সম্বন্ধে যে তিনটি নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন নিউটন সেইগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং তাহা হইতে বিশ্বাকর্ষণের দূরত্বমূলক নিয়ম ও অন্যান্য কয়েকটি নিয়ম আবিষ্কার করেন।

দ্রব্যের ওজন ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আক্ষেপিক গুরুত্ব। তিনি নির্দ্ধারণ করেন যে বিশ্বাকর্ষণই দ্রব্যসমূহের ওজনের কারণ এবং সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি পৃথিবী অপেক্ষা কতগুণ গুরু বা লঘু তাহাও তিনি নির্ণয় করেন, যথা চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় তিরাশি গুণ লঘু এবং সূর্য্য ৩১৬০০০ গুণ ভারী।

জোয়ার ভাটার কারণ।—তিনি দেখাইয়াছেন যে চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণের জন্যই সমুদ্রে জোয়ার ভাটা খেলে; এবং জোয়ার ভাটার পরিমাণও তিনি গণনা করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর আকার।—তিনি কেবলমাত্র গণনার দ্বারা সপ্রমাণ করেন যে পৃথিবী ঠিক গোলাকার নহে, উত্তর দক্ষিণে একটু চাপা এবং কতটা চাপা তাহাও সঠিক নির্ণয় করেন। তিনি দেখাইলেন যে ভূমধ্য-রেখা-ব্যাস মেরু-রেখা-ব্যাস অপেক্ষা ২৮ মাইল বড়।

গ্রহগণের পরস্পর আকর্ষণ জনিত তাহাদের গতির বিকৃতি।—তিনি দেখিলেন যে প্রত্যেক গ্রহ কেবল সূর্য্যের দ্বারা

আকৃষ্ট হয় না, অন্যান্য গ্রহের দ্বারাও হইয়া থাকে, সেই জন্য উহাদের গতির বিবিধ বিকৃতি সাধিত হইয়া থাকে। তিনি এই সকল ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন ও তাহাদের পরিমাণও নির্দ্ধারণ করেন।

ধূমকেতু।—তিনি দেখাইলেন যে অনিশ্চিত ধূমকেতুও বিশ্বাকর্ষণের অধীন এবং তাহারা পরবলয় (parabola) আকারে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া থাকে। তাহাদের পুনরাগমনের কালও গণনা করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত এই সকল তথ্য ভিন্ন বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা ও গণনা এই মহাগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি গ্রন্থের শেষভাগে এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি ও গতির অনন্ত সৌন্দর্য্য মানসপটে নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তিনম্রমস্তকে জগতস্রষ্টার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বিদায়গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠকগণকে বুঝাইতে হইবে না যে এই বিশ্বাকর্ষণ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র এক সম্পূর্ণ অভিনব শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। এখন আর গ্রহজ্যোতিষ্কবর্গ মানবনেত্রের সম্মুখে লক্ষ্যহীন বস্তুর ন্যায় বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিতেছে না, উহারা পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া একটি সম্পূর্ণ সমষ্টির অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

বিশ্বাকর্ষণ ও প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের আলোচনা করিতে গিয়া নিউটনের জীবন ঘটিত ঘটনাবলীর উল্লেখ করিবার অবসর পাই নাই। আমরা ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্লেগের বৎসরে তাঁহাকে স্বগ্রামের বাটীর বাগানে বসিয়া বৃক্ষ-পতিত আপেল ফল সম্বন্ধে চিন্তা করিতে দেখিয়া আসিয়াছি। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি যে কলেজে পড়িতেন

সেই কলেজের ফেলো নির্ব্বাচিত হন এবং দুই বৎসর পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত লিউকেশিয়ান-অধ্যাপক-পদে ডাক্তার ব্যারোর স্থানে নিযুক্ত হন। ডাক্তার ব্যারো অবসর গ্রহণ করিবার সময়, অঙ্কশাস্ত্রে নিউটনের অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়া, নিজেই তাঁহার নিয়োগের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এইরূপে নিউটন মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। ক্রমশঃ তাঁহার যশ পরিব্যাপ্ত হইতে থাকিলে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত রয়েল সোসাইটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার পাঁচ বৎসর পরে তিনি পার্লামেণ্ট মহাসভার একজন সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হন এবং ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে টাকশালের কর্ত্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রয়েল সোসাইটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং যাবজ্জীবন তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ।

(Dispersion of Sunlight)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ১৬৬৬ সাল হইতে ১৬৭২ বা তাহার কিছুকাল পর পর্য্যন্ত নিউটনের বিশ্বাকর্ষণ সম্বন্ধে গবেষণা বন্ধ ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া এই কয় বৎসর তিনি যে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা নহে। ঐ সময় তিনি আলোকশাস্ত্রে (optics) মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং আলোক সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়া

গিয়াছেন যে, যে বিষয়ে গবেষণা করিতে হইবে সেই বিষয়ে একেবারে অনন্যমনা হইতে না পারিলে আশানুরূপ ফল প্রাপ্তি ঘটে না। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ একাগ্রতা সহকারে আলোকশাস্ত্রের কয়েকটি আবিষ্কার লইয়া এই কয় বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। রামধনুর বিচিত্র বর্ণ দেখিয়াছেন ত? কিন্তু ঐ বিচিত্র বর্ণ কেমন করিয়া হয়? সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে এনটনিও ডমিনিস নামক একজন ইটালিয় ধর্ম্মযাজক সর্ব্বপ্রথমে রামধনুর বর্ণের সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে সূর্য্যকিরণ জলবিন্দুর উপর প্রতিভাত হইয়া রামধনুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাহার পর ডেকার্টে দেখাইয়াছিলেন যে সূর্য্য-কিরণ একটি ত্রিশিরা (prism) কাচের মধ্য দিয়া যাইলে রামধনুর ন্যায় বিচিত্র বর্ণ উৎপাদন করে। কিন্তু নিউটনের পূর্ব্বে কেহই স্থির করিতে পারেন নাই যে কেন এবং কিরূপে এইরূপ বিচিত্র বর্ণের উদ্ভব হইয়া থাকে।

নিউটন একটি অন্ধকার ঘরের জানলায় একটি গোল ছিদ্র করিয়া তন্মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি আনয়ন করিয়া একটি ত্রিশিরা কাচের মধ্যে প্রেরণ করিয়া দেখিলেন যে অপর দিকস্থ একটি পর্দ্দার উপর একটি লম্বা রামধনুর বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট বর্ণচত্র (spectrum) শোভা পাইতেছে। সেই বর্ণছত্রে তিনি সাতটি রং উপরি উপরি দেখিতে পাইলেন—সর্ব্বনিম্নে লাল, তাহার উপরে কমলালেবুর রং, তাহার উপর হরিদ্রার রং, সবুজ রং, নীল রং, গাঢ় নীল, সর্ব্বোপরি বেগুনে রং।' বাস্তবিক বর্ণছত্র যে ঠিক সাতটি রঙের সমবায় তাহা নহে—অসংখ্য রং উহাতে আছে,

তবে সাতটি রং বেশ ধরা যায়। এখন নিউটনের জিজ্ঞাস্য হইল দুইটি বিষয়—প্রথম, এই বিচিত্র বর্ণছত্র সূর্য্যের শ্বেত আলোক হইতে কিরূপে আসিল? এবং দ্বিতীয়, বর্ণছত্র গোল না হইয়া লম্বা হইল কেন? এই দুইটি প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য তিনি বর্ণছত্রের প্রত্যেক রং এক একটি করিয়া অপর একটি ত্রিশিরা কাচের মধ্যে প্রেরণ করিয়া উহা আর একটি পর্দ্দায় ধরিলেন। তাহাতে তিনি দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিলেন—প্রথম, এই সাতটি রঙ্গের কোনটিও ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া গিয়া আর ভাঙ্গিয়া অন্য রঙ্গে পরিণত হইতেছে না, লাল রং লালই থাকিয়া যাইতেছে, বেগুনে রং বেগুনেই থাকিতেছে। দ্বিতীয়—যে রংটি বর্ণছত্রে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, এখনও উহা ঠিক পর পর সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহা হইতে তিনি তাঁহার দুইটি প্রশ্নেরই উত্তর পাইলেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে স্থির করিলেন যে যখন লাল প্রভৃতি সাতটি রং বিশ্লিষ্ট হইয়া অন্য রঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছে না, তখন উহারা আদি রং (primitive colours) এবং সূর্য্যের শ্বেত আলোক এই সাতটি আদি রঙ্গের সমষ্টি বা সংমিশ্রণ; ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া যাইবার সময় শ্বেত আলোক বিশ্লিষ্ট হইয়া সাতটি আদি রঙ্গে পরিণত হয়। তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্নেরও উত্তর মিলিল—তিনি দেখিতে পাইলেন যে সাতটি রং ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া যাইবার সময় বিভিন্ন পরিমাণে বাঁকিয়া (refracted) যায়;—লাল রং সর্ব্বাপেক্ষা কম বাঁকিয়া থাকে আর বেগুণে রং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাঁকিয়া যায় এবং অন্য অন্য রংগুলি এই দুই রংএর মাঝামাঝি পরিমাণে বাঁকিয়া থাকে।

সেই জন্যেই বর্ণছত্রে লাল রং সর্ব্বনিম্নে থাকে এবং বেগুনে রং সকলের উপরে থাকে আর অপর রংগুলি এই দুয়ের মাঝামাঝি থাকে। এইরূপে রংগুলির জন্য বিভিন্ন স্থানের সংকুলান করিতে গিয়া বর্ণছত্র লম্বা হইয়া পড়ে।

এই সকল পরীক্ষার দ্বারা নিউটন দুইটি বিষয় আবিষ্কার করিলেন—প্রথম, সূর্য্যালোক আদি রং নহে, উহা সাতটি রঙের সমষ্টি বা সংমিশ্রণ; দ্বিতীয় প্রত্যেক রং ত্রিশিরা কাচের মধ্যে দিয়া যাইবার সময় বিভিন্ন ভাবে বাঁকিয়া যায়। নিউটন শুধু শ্বেতালোক বিশ্লিষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি সাতটি আদি রং মিলাইয়া শ্বেত রং প্রস্তুত করিয়াও গিয়াছেন। একখানি কার্ডবোর্ডের বড় চাকৃতিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে পূর্ব্বোক্ত সাত রংঙের কালি দিয়া সমান করিয়া পাঁচটি বর্ণছত্র আঁকিলেন, তাহার পর এই চাকতিখানি একটি ঘোরাইবার যন্ত্রের উপর রাখিয়া জোরে জোরে ঘুরাইতে লাগিলেন; ঘুরাইবার সময় সাতটি রং এক সঙ্গে চক্ষুতে প্রতিভাত হইবার দরুণ একত্র মিলিত হওয়াতে সাদা বা ঈষৎ ধূসরবর্ণের সাদা দেখাইতে লাগিল। একেবারে সাদা না দেখাইবার কারণ আর কিছুই নয়—সকল কালির রং বর্ণছত্রের সাতটি রঙের ঠিক অনুরূপ হয় না।

নিউটন শ্বেত আলোকের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া রঙের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন দ্রব্যের রং দ্রব্যে নাই, উহা আলোকে আছে। লাল দ্রব্য যে লাল দেখায়—তাহার কারণ এই যে, ঐ দ্রব্য লাল ব্যতীত অন্য রঙের আলোক শোষণ করিয়া থাকে, কেবল লাল আলোক
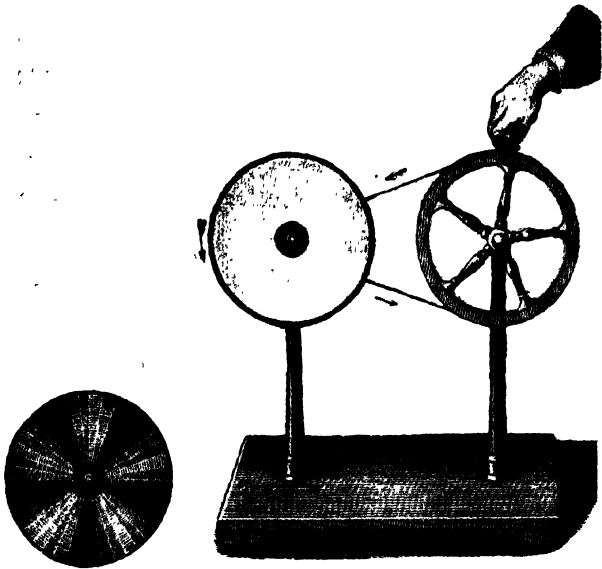
সাতরঙ্গে রঞ্জিত কার্ডবোর্ডকে ঘুরাইয়া শ্বেতবর্ণের দেখাইতেছে।

শোষণ করিতে পারে না। নীল কাচের মধ্যে দিয়া সূর্য্যালোক যাইলে সূর্য্যালোক নীল হইয়া যায়, তাহার কারণ নীল কাচ সূর্য্যালোকের আর সকল প্রকার রঙ্গের আলোককে শোষণ করিয়া ফেলিয়া কেবল নীল আলোককে যাইতে দেয়। নিউটনের এই অভিনব মত তখনকার প্রচলিত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। অনেকে তাঁহার এই মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

"অপ্‌টিকস্‌" গ্রন্থ।

নিউটন আলোক সম্বন্ধে আরও অনেক আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আলোক সম্বন্ধে বিবিধ আবিষ্কার তাঁহার "অপ্‌টিক্‌স্‌" (optics) নামক দ্বিতীয় মহাগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি আর কিছু না করিয়া যদি কেবল এই গ্রন্থখানিই রচনা করিয়া যাইতেন তাহা হইলেও তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। এখানে এই সকল আবিষ্কারের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া সংক্ষেপে দুই একটির উল্লেখ করা গেল মাত্র।

নূতন দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার।

সুপ্রসিদ্ধ ইটালীয় বৈজ্ঞানিক গেলিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যন্ত্রে কাচ নির্ম্মিত উন্নতোদর লেন্স (convex lens) ব্যবহৃত হইত বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বর্ণছত্র ছবির চারিপাশে দেখা যাইত। তাহাতে ছবি অস্পষ্ট হইত। নিউটন কাচের লেন্স পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার উজ্জ্বল ধাতুনির্ম্মিত নতোদর দর্পণ (concave metallic mirror) ব্যবহার করিলেন। এইরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে "পরাবর্ত্তনীয় দূরবীক্ষণ যন্ত্র" (reflecting telescope) বলে এবং আধুনিক অনেক বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিউটনের আবিষ্কৃত যন্ত্রের অনুযায়ী করিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তাঁহার নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি রয়েল সোসাইটীতে এখনও রক্ষিত আছে। উহার একখানি প্রতিকৃতি এখানে প্রদত্ত হইল।
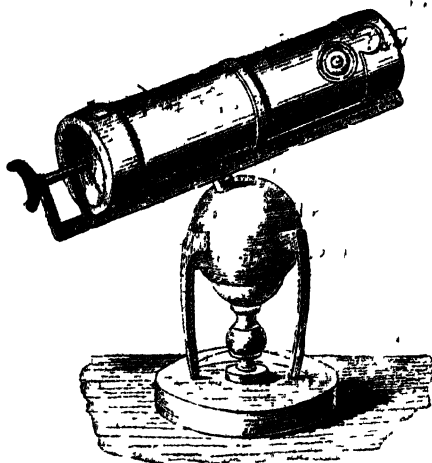
নিউটনেব দূববীক্ষণ যন্ত্র।

ষষ্ঠাংশ যন্ত্র—(Sextant)। আধুনিক নাবিকেরা ষষ্ঠাংশ যন্ত্র এখন যে আকারে ব্যবহার করেন তাহার আবিষ্কর্ত্তা নিউটন।

আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত।

আলোক কিরূপে উৎপন্ন হয় সে সম্বন্ধে নিউটনের মত এই ছিল যে আলোকিত দ্রব্য হইতে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ নির্গত হইয়া আমাদের চক্ষে পতিত হয় বলিয়া আলোকের উদ্ভব হয়। এই সিদ্ধান্তকে আলোকের "নির্গম সিদ্ধান্ত" (emission theory) বলে। আলোক সম্বন্ধে নিউটনের এই সিদ্ধান্ত এখন আর প্রচলিত নাই। এখন স্থির হইয়াছে যে ইথার (ether) বা

ব্যোম নামক সর্ব্বত্র বিদ্যমান অতি সূক্ষ্ম পদার্থের হিল্লোলে আলোকের উদ্ভব হইয়া থাকে।

শব্দের গতি নির্ণয়।

আলোক সম্বন্ধে গবেষণা ব্যতীত শব্দ (sound) সম্বন্ধেও তাঁহার অনেক গবেষণা আছে। শব্দ সম্বন্ধে বিবিধ গবেষণা তাঁহার প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরা ব্যোম বা আকাশের (ether) গুণ শব্দবহন বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সপ্রমান করিয়াছে যে ইথার প্রকৃতপক্ষে শব্দবহ নহে, বায়ুই শব্দবহ। শব্দিত দ্রব্যের দ্বারা বায়ুর মধ্যে তরঙ্গ উত্থিত হয় এবং সেই তরঙ্গ কর্ণপটাহে আঘাত করে বলিয়া আমরা শব্দ শুনিতে পাই। শব্দজনিত বায়ুর তরঙ্গ কিরূপে উত্থিত ও পতিত হয় নিউটন তাহা সঠিক ব্যাখ্যা করিয়া যান এবং শব্দের গতিও (velocity) নির্ণয় করেন। তাঁহার গণনা একেবারে সঠিক না হইলেও তাহা প্রথম চেষ্টার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

নিউটনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা শুধু জ্যোতিষ ও পদার্থ-বিদ্যার গবেষণাতে ক্ষান্ত হয় নাই, নিউটন রসায়নশাস্ত্রেও গবেষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার ডায়মণ্ড নামক কুকুর তাঁহার অনুপস্থিতে একদিন একটা বাতি উল্টাইয়া ফেলিয়া দেওয়াতে সেই আগুনে তাঁহার রাসায়নিক গবেষণার পাণ্ডুলিপিগুলি সব পুড়িয়া গিয়াছিল। তিনি এই দুর্ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং কুকুরটিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "ডায়মণ্ড! ডায়মণ্ড! তুমি জান না যে তুমি

আজ কি ক্ষতিই করিয়াছ!" এই দুর্ঘটনার পর তিনি আর কোনও বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নিউটন আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, অনেক সময় তাহা জনসমাজে প্রচারিত করিবার কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইত না। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে অনেক সময় তাঁহাকে স্বীয় আবিষ্কারের মৌলিকতা লইয়া অপরের সহিত বিবাদ করিতে হইত। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শূন্যবৃদ্ধি-সিদ্ধান্ত (theory of fluxions) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার বহু পরে অর্থাৎ ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে উহা প্রকাশিত হয়। উহা প্রকাশিত হইবামাত্র বিখ্যাত জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক লাইবনিটজের সহিত উক্ত আবিষ্কারের পূর্ব্বপর লইয়া তাঁহার বিলক্ষণ তর্কবিতর্ক হইতে থাকে। যদি তিনি উক্ত আবিষ্কার সময়মত প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে লাইবনিটজের দাবী আদৌ উঠিত না। ফলে যে সময় উহা প্রকাশিত হইয়াছিল সেই সময়ে জার্ম্মাণিতেও উহা লাইবনিটজ দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আবার যখন "প্রিন্সিপিয়া" রচনার অনেক পরে উহা হ্যালে কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল তখনও হুক নামক আর একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক তাঁহার আবিষ্কারের ভাগ লইবার দাবী করিয়া বসিলেন। আসল কথা এই যে বিশ্বাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের আবিষ্কার যথাসময়ে প্রকাশিত না হওয়াতে হুক, রেন, হ্যালে প্রভৃতি অপরাপর বৈজ্ঞানিকগণও ঐ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। সমকালীন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকজগতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অপ্রীতিকর তর্কবিতর্ক চিরশান্তিপ্রিয় নিউটনকে

বড়ই মর্ম্মপীড়া দিত। তিনি একদা বলিয়াছিলেন "বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এমনই মোকদ্দমাপ্রিয় যে তাঁহার অনুচরবর্গকে তাঁহার সেবা করিতে হইলে বিলক্ষণ আইনজ্ঞও হইতে হইবে।" আর এক সময় তিনি লাইবনিটজকে লিখিয়াছিলেন "আমার আলোক সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লইয়া তর্কবিতর্কে আমি এত উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে আমার দুঃখ হয় যে একটা ছায়ার পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া আমি আমার জীবনের সুখশান্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি।"

নিউটনের শেষজীবন স্বচ্ছন্দেই কাটিয়াছিল। তিনি টাকশালের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়া বাৎসরিক বারশত পাউণ্ড মাহিনা পাইতেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ইউরোপের সর্ব্বত্রই সম্মানিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্ঞী অ্যান ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, বোধ হয় বিবাহ করার কল্পনাও তাঁহার মনে কখনও উদিত হয় নাই। তাঁহার এক ভাগিনেয়ী ও তাঁহার স্বামী তাঁহার গৃহস্থালী রক্ষা করিতেন। তিনি চিরকাল ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোচনাও করিতেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ২০ই মার্চ্চ তারিখে পঁচাশী বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার এবীতে মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি হয় এবং ছয়জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার শবাধার বহন করেন। গেলিলিওর শোচনীয় পরিণাম ও তাঁহার প্রতি ইটালীবাসীগণের অকৃতজ্ঞতার কথা মনে করিলে যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে হয় তেমনি নিউটনের প্রতি ইংলণ্ডের অধিবাসীগণের এইরূপ সম্মানপ্রদর্শনে আনন্দ হয়।

নিউটনের আবিষ্কার কাহিনী সম্যক পাঠ করিলে স্বতই বিস্মিত হইতে হয় যে কেমন করিয়া এক ব্যক্তি এতগুলি আবিষ্কার

করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে পঠদ্দশাতেই তিনি দ্বিপদ সিদ্ধান্ত (binomial theorem) ও শূন্যবৃদ্ধি সিদ্ধান্ত (theory of fluxions) আবিষ্কার এবং শ্বেত আলোক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তাহা ভিন্ন দিক্‌দর্শন যন্ত্রের উন্নতিসাধন, ষড়াংশযন্ত্র নির্ম্মাণ, আলোক্-সিদ্ধান্ত, রং সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, শব্দের গতিনির্ণয় প্রভৃতি বহুবিধ আবিষ্কার তিনি একাই করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কারগুলি যদি দুইজন বৈজ্ঞানিক মিলিয়া করিতে পারিতেন তাহা হইলে প্রত্যেকেই এক একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি যখন দেখিতে পাই যে এ সকল ভিন্ন তিনি বিশ্বাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া জগৎ সৃজনের একটি গূঢ় রহস্য উৎঘাটন করিয়া গিয়াছেন, অনন্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর ব্যোমমার্গে অত্যদ্ভুত ভ্রমণবৃত্তান্তনিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব উৎঘাটিত করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জ্যোতিষ শাস্ত্রকে এক অভিনব সূত্রে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন তখনই তাঁহার অতিমানুষিক মানসিক শক্তির প্রাখর্য্য উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হই। এইরূপ একজন বিস্মিত ফরাসী বৈজ্ঞানিক বলিয়া গিয়াছেন "নিউটন কি আমাদের মত মানুষের ন্যায় পানাহার করিতেন ও নিদ্রা যাইতেন? আমার নিকটে তিনি কিন্তু স্বর্গের দেবতা বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন—যেন তিনি এই মরজগতের বাঁধাবাঁধির অতীত।" অথচ এই মহাপুরুষ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন "আমি কেবল জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসিয়া পাথর কুড়াইয়াছি মাত্র, অনন্ত জ্ঞানসমুদ্র অনাবিষ্কৃতভাবে আমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে।" যিনি "মহতো মহীয়ান" তাঁহার জগৎসৃষ্টির অনন্ত রহস্যের মধ্যে যিনি ডুবিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন এই কথা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নাগার্জ্জুন।

যেমন নব্য রসায়নের জন্মদাতা বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক ল্যাভোয়াসিয়ে, সেইরূপ ভারতীয় প্রাচীন রসায়নের জন্মদাতা বলিয়া যদি কোন একজনকে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা হইলে নাগার্জ্জুনকে নিঃসন্দেহে ভারতীয় রসায়নের জন্মদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বহুবিধ তান্ত্রিক গ্রন্থে নাগার্জ্জুন তীর্য্যক্‌পাতন প্রক্রিয়া (Distillation) এবং ধাতুর জারণ ও মারণ প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। এখানে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। চক্রপাণি লৌহমারণ বর্ণনাকালে উহা নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। চক্রপাণি "নাগার্জ্জুন বর্ত্তি" বর্ণনাকালে লিখিয়া গিয়াছেন "নাগার্জ্জুনেন লিখিতা স্তম্ভে পাটলিপুত্রকে"; ঐ বর্ত্তির একটী উপাদান মারিত তাম্র। রসেন্দ্রচিন্তামনি নাগার্জ্জুনকে তির্য্যক-পাতন প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, "তির্য্যক্‌পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধনাগার্জ্জুনাদিভিঃ"। চক্রপাণি লৌহমারণ নাগার্জ্জুনের আবিষ্কার বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন— "নাগার্জ্জুনো মুনীন্দ্রঃ শশাস চল্লৌহশাস্ত্রমতিগহনম্।" নিত্যনাথ বিরচিত রসরত্নাকর নামক রসগ্রন্থে "ব্যাধিতানাং হিতার্থায় প্রোক্তং নাগার্জ্জুনেন যৎ" এই শ্লোকে নাগার্জ্জুনকে একজন

রসবিষয়ক উপদেষ্টা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন রসার্ণব, রসরত্নসমুচ্চয়, রসরাজলক্ষ্মী, রসকল্পসুধাকর প্রভৃতি যাবতীয় তান্ত্রিক গ্রন্থে নাগার্জ্জুন একজন প্রধান রসবিষয়ক উপদেষ্টা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। নাগার্জ্জুন রসরত্নাকর, আরোগ্যমঞ্জরী, রসেন্দ্রমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নাগার্জ্জুনের আবির্ভাব কাল।

এই রাসায়নিক নাগার্জ্জুন এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা সিদ্ধ নাগার্জ্জুন একই ব্যক্তি বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্বনাচার্য্যের মতে নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা। মহাযান প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন যে একজন রাসায়নিক ও চিকিৎসাপারদর্শী ছিলেন সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ বৌদ্ধ পালি, তিব্বতীয় ও চীন ভাষায় লিখিত নানা গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বিখ্যাত চীন পর্য্যটক হুয়েন স্যাং সপ্তম শতাব্দীতে ভারত-পর্য্যটনে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতে আসিয়া নাগার্জ্জুনকে একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ও রাসায়নিক বলিয়া শুনিয়া গিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে নাগার্জ্জুনের চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শীতা সম্বন্ধে বিস্তর অতিমানুষিক কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক বহু মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ সমূহে নাগার্জ্জুন একই কালে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও রাসায়নিক বলিয়া বর্ণিত আছেন।

নাগার্জ্জুনের আবির্ভাব কাল লইয়া অনেক মতভেদ আছে।

যে সকল প্রমাণের দ্বারা তাঁহার আবির্ভাবকাল নিরূপিত হইতে পারে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

প্রথম। চীন পর্য্যটক হুয়েন স্যাং নাগার্জ্জুনকে রাজা শত-বাহনের বন্ধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয়। পঞ্চম খৃষ্টাব্দে নাগার্জ্জুনের জীবনী চীন ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল।

তৃতীয়। হর্ষচরিতকার বান নাগার্জ্জুনকে রাজা শতবাহনের সমসাময়িক করিয়াছেন।

চতুর্থ। রাজতরঙ্গিনীর মতে নাগার্জ্জুন কনিষ্কের সম-সাময়িক ছিলেন।

পঞ্চম। ডাক্তার রায় নাগার্জ্জুন কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ রস—রত্নাকর নামক গ্রন্থের যে অংশ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে নাগার্জ্জুন, রাজা শালীবাহন, রত্নঘোষ ও মণ্ডব্যের সহিত কথোপ-কথন ছলে রসক্রিয়া বর্ণিত আছে।

ষষ্ঠ। মূল সংস্কৃত "সুহৃল্লেখা" নামক লুপ্ত পুস্তকের তিব্বতীয় ও চীন ভাষায় অনুবাদে নাগার্জ্জুনকে রাজা শতবাহনের বন্ধু বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

সপ্তম। প্রসিদ্ধ মুসলমান জ্যোতিষী এলবেরুনি মহম্মদ গজনবীর ভারত আক্রমণ কালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি একজন নাগার্জ্জুনের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই নাগার্জ্জুন সোমনাথের নিকট জন্মগ্রহণ করেন এবং রসায়নের সার সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এলবেরুনি আরও বলিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য এবং তিনি এলবেরুনির একশত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

উপরোক্ত প্রমাণগুলি হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে অধিকাংশ প্রমাণ অনুসারে নাগার্জ্জুন রাজা শতবাহনের সমসাময়িক ব্যক্তি। এই শতবাহন দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র বংশের একজন প্রসিদ্ধ নরপতি। দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র বংশ খৃষ্টপূর্ব্ব ৭৩ সাল হইতে খৃষ্টপরে ২১৮ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই অন্ধ্র বংশ শতবাহন বংশ নামে প্রসিদ্ধ। শতবাহন বংশের ঠিক কোন নৃপতি নাগার্জ্জুনের সমসাময়িক ছিলেন তাহা সঠিক স্থির করা কঠিন। সেই জন্য আমরা নাগার্জ্জুনকে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দীর রাসায়নিক বলিয়া স্থির করিলাম।

নাগার্জ্জুন দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক হইলে হুয়েন স্যাং এর শ্রুত কিম্বদন্তীর অর্থ সঙ্গত হয়। রসরত্নাকরের রাজা শালীবাহন খুব সম্ভবতঃ রাজা শতবাহনের সহিত অভিন্ন। রাজতরঙ্গিনীর মতে নাগার্জ্জুন রাজা কনিষ্কের সমসাময়িক। কিন্তু কনিষ্কের কাল লইয়া বিলক্ষণ মতভেদ আছে। ফ্লিট (Fleet) সাহেব কনিষ্কের রাজত্ব আরম্ভের কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৭ সাল করিয়াছেন, ভিন্সেণ্ট স্মিথ ১২০ খ্রীষ্টাব্দ করিয়াছেন এবং ভাণ্ডার্কার ২৭৮ খ্রীষ্টাব্দ করিয়াছেন। কনিষ্কের যে কালই নির্দ্ধারিত হউক, নাগার্জ্জুনকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বেশী ভুল হইবে না। এলবেরুনি নিশ্চয়ই নাগার্জ্জুনের কাল ভুল করিয়াছেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিতেন এবং "রস" অর্থে পারদ না করিয়া "স্বর্ণ" করিয়া গিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন যে, নাগার্জ্জুনের গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য, অথচ লিখিতেছেন যে, মাত্র একশত বৎসর পূর্ব্বে নাগার্জ্জুন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রুত কথার উপর নির্ভর করিয়া অন্য প্রমাণের বিরোধী মত গ্রাহ্য হইতে পারে না।

নাগার্জ্জুনের চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান।

মাধ্যমিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন যে রসায়ন ও চিকিৎসা শাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন সে সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এই সকল কিম্বদন্তীর মধ্যে একটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে সংগৃহিত "নাগার্জ্জুনের জীবনীসংগ্রহ" নামক পুস্তকে নিম্নলিখিত কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ আছে।

"বিদর্ভ দেশের একজন ধনী ব্রাহ্মণের অনেক দিন যাবৎ সন্তানাদি হয় নাই। এক রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে তিনি একশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হইবে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে (এই পুত্রই নাগার্জ্জুন) জ্যোতির্ব্বিদগণ বলিলেন যে যদি পুত্রের পিতামাতা একশত ভিক্ষুক ভোজন করান তাহা হইলে পুত্রটি সাত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার পর তাহার আর আয়ু নাই। সাত বৎসর যখন প্রায় গত হয় তখন পিতামাতা দুঃখে পুত্রকে একটি নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া আইসেন। সেই সময়ে একদিন মহাবোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর খসর্পণ ছদ্মবেশে নাগার্জ্জুনকে দেখা দেন এবং বলেন যে মগধে নলেন্দ্রবিহারে যাইলে তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন। তিনি নলেন্দ্রবিহারে যাইলে, বিহারাধ্যক্ষ শ্রীসরহভদ্র নাগার্জ্জুনকে ভিক্ষুক-পদে দিক্ষীত করিলেন। কিছুকাল পরে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে অর্থ উপার্জ্জন মানসে অন্যান্য ভিক্ষুকগণের পরামর্শে নাগার্জ্জুন অন্যান্য ধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তন করিবার প্রক্রিয়া শিক্ষা করিবার জন্য মহাসমুদ্রের

মধ্যস্থিত একটি দ্বীপে জনৈক সাধুপুরুষের নিকট যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি বিদ্যাবলে একটি সম্মোহিত বৃক্ষের দুইটি পত্র একত্র করিয়া তদুপরি আরোহণ করিয়া সেই দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। .....নাগার্জ্জুন স্বর্ণপ্রস্তুতপ্রক্রিয়া শিক্ষা করিয়া নলেন্দ্র-বিহারে ফিরিয়া আসেন এবং প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ উৎপাদন করিয়া সেই অর্থে তিনি সমস্ত ভিক্ষুকদিগকে পরিপোষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পরে যোগশিক্ষা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। নাগার্জ্জুন অনেক চৈত্য বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বিজ্ঞান, চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও রসায়ন সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীসরহভদ্রের মৃত্যুর পর নাগার্জ্জুন নলেন্দ্রবিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া খুব দক্ষতার সহিত বিহারের কার্য্য পরিচালনা করেন। তাঁহার গুরু সরহভদ্র মাধ্যমিক দর্শনের মাত্র বীজ রোপন করিয়াছিলেন, তিনি এই দর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তিতে স্থাপন করেন।”

উপরোক্ত ও অন্যান্য কিম্বদন্তী হইতে জানা যায় যে পূর্ব্বে নাগার্জ্জুন ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দিক্ষিত হন। শ্রীসরহভদ্র তাঁহার গুরু ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর নাগার্জ্জুন নলেন্দ্রবিহারের অধ্যক্ষ হন। তিনিই মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এবং একইকালে রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা।

সুশ্রুতের টীকাকার ডল্বনাচার্য্যের মতে নাগার্জ্জুন প্রাচীন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা ও সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রের রচয়িতা। এই

উত্তরতন্ত্রে বিবিধ ব্যাধি ও কায়চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। সুশ্রুতের অন্যান্য স্থানে অস্ত্রচিকিৎসারই বর্ণনা বিশদভাবে আছে, কায়চিকিৎসার বর্ণনা খুব সামান্য।

তির্য্যকপাতন (Distillation) আবিষ্কার।

রসেন্দ্রচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থের মতে নাগার্জ্জুন তির্য্যকপাতন প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা। তির্য্যকপাতন প্রাচীনকালে প্রধানতঃ সুরা ও পারদ বিশুদ্ধ করিবার জন্যই আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। রসেন্দ্রচিন্তামণিতে নাগার্জ্জুন প্রভৃতি ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত তির্য্যক-পাতন প্রক্রিয়া নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত আছে;—দুইটী কলসী লইয়া একটি কলসীতে পারদ ও অপর কলসীতে জল রাখিয়া উভয় কলসীকে তির্য্যক ভাবে বসাইতে হইবে এবং উভয়ের মুখ একত্রিত করিয়া সেই জোড়মুখ রুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। অতঃপর যে কলসীতে পারদ আছে সেই কলসীতে জ্বাল দিতে থাকিবে, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত পারদ জলযুক্ত কলসীতে প্রবিষ্ট হয়। (১) এই প্রক্রিয়া আধুনিক তির্য্যকপাতন প্রণালীর পূর্ব্বাভাস। জলযুক্ত কলসী condenser এর কার্য্য করিতেছে। জল পাতিত

---

(১) ঘটে রসং বিনিক্ষিপ্য সজলং ঘটমন্যকং।
তির্য্যঙ্মুখং দ্বয়ং কৃত্বা তন্মুখং রোধয়েৎ সুধীঃ।
রসাধো জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎ সূতো জলং বিশেৎ।
তির্য্যকপাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধৈর্নাগার্জ্জুনাদিভিঃ॥
রসেন্দ্রচিন্তামণি।

করিতে হইলে জলযুক্ত কলসীর বদলে খালি কলসী ব্যবহৃত হইত এবং কলসীর উপর বহির্দ্দেশে জল ঢালিয়া উহাকে শীতল রাখিতে হইত।

ধাতুর জারণ মারণ আবিষ্কার।

বহুবিধ তান্ত্রিকগ্রন্থ একবাক্যে নাগার্জ্জুনকে লৌহ প্রভৃতি ধাতুর জারণ মারণ প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। এই ধাতুমারণ প্রক্রিয়া ও নীচ ধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তন করিবার প্রক্রিয়ার আবিষ্কার হইতেই রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি। এই দুই প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া ভারতে নাগার্জ্জুন রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতার গৌরবের অধিকারী।

ধাতুবর্গের মারণ প্রক্রিয়ার প্রথম উল্লেখ আমরা সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রে দেখিতে পাই। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ডল্বনাচার্য্যের মতে সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রের রচয়িতা নাগার্জ্জুন। যদি নাগার্জ্জুন উত্তরতন্ত্রের রচয়িতা হন তাহা হইলে উত্তরতন্ত্রে বর্ণিত ধাতুর অয়স্কৃতিবিধি নাগার্জ্জুন প্রবর্ত্তিত ধাতুমারণ প্রক্রিয়ার প্রথম পরিচয়। এই অয়স্কৃতিবিধি ভারতে ধাতুর যৌগিক (compound) প্রস্তুতপ্রক্রিয়ার প্রথম চেষ্টা। সুশ্রুতে লৌহ ও অন্যান্য ধাতুর অয়স্কৃতি প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত আছে :—"লৌহের অতি সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লবণবর্গের প্রলেপ দিবে, পরে সেই লবণলিপ্ত লৌহপাত গোময়াগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ত্রিফলা ও সালসারাদিগণের ক্বাথ দ্বারা নির্ব্বাপিত করিবে। এইরূপে ষোলবার দগ্ধ ও নির্ব্বাপিত করার পর পুনর্ব্বার তাহা খদির কাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে।

শীতল হইলে সেই লৌহ সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া ঘন কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। সেই লৌহচূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে। এইরূপে অন্যান্য ধাতুর যথা রঙ্গ, সীস, তাম্র, রৌপ্য ও সুবর্ণের অয়স্কৃতি প্রয়োগ করিতে পারা যায়।" (১) এই উপায়ে ধাতুর অক্সাইড্. ক্লোরাইড্ বা অক্সিক্লোরাইড্ প্রস্তুত হইবে।

চক্রপাণি নাগার্জ্জুনের লৌহমারণ প্রক্রিয়ার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন, বাহুল্যভায়ে সমস্তটা উদ্ধৃত হইল না। স্থূলতঃ লৌহকে ত্রিফলার ও অন্যান্য ভেষজের রসে ভাবনা দিয়া পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে সরার মধ্যে উত্তপ্ত করিয়া মারিত লৌহ প্রস্তুত হইত। এই প্রক্রিয়া স্থালীপাকবিধি, পুটপাকবিধি প্রভৃতি প্রক্রিয়াতে বিভক্ত হইয়াছে। এই প্রক্রিয়া বর্ণন কালে চক্রপাণি দুইস্থানে নাগার্জ্জুনের নাম করিয়াছেন যথা—"নাগার্জ্জুনো মুনীন্দ্রঃ শশাস যল্লোহশাস্ত্রমতিগহণম্", "লৌহস্য পাকমধুনা নাগার্জ্জুনশিষ্টমভিদধ্মঃ"। নাগার্জ্জুনের এই লৌহমারণবিধি রসেন্দ্রচিন্তামণিতে আমূল উদ্ধৃত হইয়াছে এবং রসেন্দ্রসারসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থও আংশিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

হীনধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তন করিবার প্রক্রিয়া।

পূর্ব্বোদ্ধৃত তিব্বতীয় কিম্বদন্তী হইতে জানিতে পারা যায় যে নাগার্জ্জুন হীনধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তন করিবার প্রক্রিয়া অবগত ছিলেন। হুয়েন স্যাং যখন সপ্তম খৃষ্টাব্দীতে ভারতে

---

(১) সুশ্রুত সংহিতা, উত্তরতন্ত্র, অয়স্কৃতিবিধি।

আগমন করেন তখন তিনি শুনিয়া গিয়াছেন যে নাগার্জ্জুন এমন ঔষধ জানিতেন যাহাতে তিনি সর্ব্ববিধ ধাতু ও প্রস্তরকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ রসরত্নাকর নামক একখানি বৌদ্ধ তান্ত্রিকগ্রন্থের খানিকটা অংশ পাইয়াছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে উহা সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর একখানি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে নাগার্জ্জুনকথিত হীন-ধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তন করিবার কয়েকটি প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। ঠিক এই সকল প্রক্রিয়া নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল কি না তাহা নির্ণয় করা কঠিন, তবে এই রকম প্রক্রিয়া নাগার্জ্জুনের সময়ে প্রচলিত থাকা সম্ভব। কৌতূহলী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য কয়েকটি প্রক্রিয়া উদ্ধৃত হইল।

(১) "রাজবর্ত্তককে শিরীশপুষ্পের রসের দ্বারা ভাবনা দিলে এক গুঞ্জা পরিমাণ রৌপ্য একশত গুঞ্জা পরিমাণ নবোদিত সূর্য্যসন্নিভ স্বর্ণে পরিণত হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি ?"

(২) "গন্ধককে পলাশের রসের দ্বারা শোধিত করিয়া

---

(১) কিমত্র চিত্রং যদি রাজবর্ত্তকং
শিরীষপুষ্পাগ্ররসেন ভাবিতম্।
সিতং সুবর্ণং তরুনার্কসন্নিভং
কারোতি গুঞ্জাশতমেকগুঞ্জয়া॥

(২) কিমত্র চিত্রম্ যদি পীতগন্ধকঃ
পলাশনির্য্যাষরসেন শোধিতঃ।
আরণ্যকৈরুৎপলকৈস্তু পাচিতঃ
করোতি তারং ত্রিপুটেন কাঞ্চনম্॥

রৌপ্যের সহিত তিনবার ঘুঁটের আগুনে পুটপাক করিলে রৌপ্য স্বর্ণে পরিণত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি ?”

(৩) “যদি রসককে (calaminc)......তিনবার তাম্রের সহিত পুটপাক করা যায়, তাহা হইলে তাম্র কাঞ্চনে পরিণত হইবে ইহাতে বিচিত্র কি ?”

(৪) মেষের দুগ্ধ ও বহু অম্লরসের দ্বারা দরদকে (cinnabar) অনেকবার ভাবনা দিলে রৌপ্য সাক্ষাৎ কুঙ্কুমসদৃশ স্বর্ণে পরিণত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ?”

অবশ্য এই সকল প্রক্রিয়ায় রৌপ্য বা তাম্র স্বর্ণে পরিণত আদৌ হইবে না, উহাতে মিশ্রধাতু (alloy) বা স্বর্ণের ন্যায় রংবিশিষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন হইবে। এই সকল প্রক্রিয়ায় পাঠক-বর্গ মনে রাখিবেন—“all is not gold that glitters ।”

কজ্জলী বা রসপর্পটী।

পারদের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ পূর্ব্বোলিখিত রসরত্নাকরে প্রথম দেখিতে পাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই গ্রন্থখানি সপ্তম

---

(৩) কিমত্র চিত্রং রসকো রসেন
ক্রমেণ কৃত্বাম্বুধরেণ রঞ্জিতঃ।
করোতি শুল্বং ত্রিপুটেণ কাঞ্চনম্॥

(৪) কিমত্র চিত্রং দরদঃ সুভাবিতঃ
পয়েন মেষ্যা বহুশোঽম্লবর্গৈঃ।
সিতং সুবর্ণং বহুধর্ম্মভাবিতং
করোতি সাক্ষাদ্বরকুঙ্কুমপ্রভম্॥

নাগার্জ্জুন-বিরচিত রসরত্নাকর।

শতাব্দীতে রচিত। এই গ্রন্থে পারদ ও গন্ধক মিলিত করিয়া কজ্জলী ও রসপর্পটিকা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে * এবং স্বর্ণ, পারদ ও গন্ধক মিলিত করিয়া অন্ধমূষায় লঘুপুটে পাক করিয়া স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই শেষোক্ত সাধকেন্দ্র ভক্ষণ করিলে দিব্যদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রসরত্নাকর নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরচিত না হইলেও সপ্তম শতাব্দীর একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ হইলে সপ্তম শতাব্দীতে কজ্জলী, রসপর্পটিকা ও স্বর্ণসিন্দুর আবিষ্কৃত ও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। রসরত্নাকরের পর বৃন্দের সিদ্ধযোগে একভাগ গন্ধক ও অর্দ্ধভাগ পারদ মিশ্রিত করিয়া "রসামৃতচূর্ণ" প্রস্তুত করিবার বিধি আছে। বৃন্দ চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী কিন্তু অধ্যাপক রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে সিদ্ধযোগের একখানি সংস্করণে "রসামৃতচূর্ণের" উল্লেখ পান নাই, কেবল কাশ্মীর হইতে আনীত পাণ্ডুলিপিতে পাইয়াছেন। বৃন্দের পর চক্রপাণি একভাগ পারদ ও একভাগ গন্ধক মিলিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহা গলাইয়া রসপর্পটী প্রস্তুত করিয়াছেন। এই প্রস্তুত প্রণালী অনেকটা রসরত্নাকরে

---

* সূতকস্য পলং গৃহ্যং তুর্য্যাংশং সাকুকং বিষম্।
তৎসমং গন্ধকং শুদ্ধং চূর্ণংকৃত্বা বিনিক্ষিপেৎ॥
কৃত্বা কজ্জলিকামাদৌ পলং দত্বা চ গন্ধকং।
ঘৃতপকঞ্চ তচ্চূর্ণং পচেদায়সভাজনে॥
যাবদ্দ্রবত্বমায়াতি তৎক্ষণাৎ তং বিনিক্ষিপেৎ।
পুটে বা কদলীপত্রে সিদ্ধং পর্পটিকারসম্॥

রৌপ্যের সহিত তিনবার ঘুঁটের আগুনে পুটপাক করিলে রৌপ্য স্বর্ণে পরিণত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি ?"

(৩) "যদি রসককে (calamine)......তিনবার তাম্রের সহিত পুটপাক করা যায়, তাহা হইলে তাম্র কাঞ্চনে পরিণত হইবে ইহাতে বিচিত্র কি ?"

(৪) মেষের দুগ্ধ ও বহু অম্লরসের দ্বারা দরদকে (cinnabar) অনেকবার ভাবনা দিলে রৌপ্য সাক্ষাৎ কুঙ্কুমসদৃশ স্বর্ণে পরিণত হইবে, তাগাতে বিচিত্র কি ?"

অবশ্য এই সকল প্রক্রিয়ায় রৌপ্য বা তাম্র স্বর্ণে পরিণত আদৌ হইবে না, উহাতে মিশ্রধাতু (alloy) বা স্বর্ণের ন্যায় রংবিশিষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন হইবে। এই সকল প্রক্রিয়ায় পাঠকবর্গ মনে রাখিবেন—"all is not gold that glitters ।"

কজ্জলী বা রসপর্পটী।

পারদের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ পূর্ব্বোলিখিত রসরত্নাকরে প্রথম দেখিতে পাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই গ্রন্থখানি সপ্তম

---

(৩) কিমত্র চিত্রং রসকো রসেন
ক্রমেণ কৃত্বাম্বুধরেণ রঞ্জিতঃ।
করোতি শুল্বং ত্রিপুটেণ কাঞ্চনম্ ॥

(৪) কিমত্র চিত্রং দরদঃ সুভাবিতঃ
পয়েন মেষ্যা বহুশোঽম্লবর্গৈঃ।
সিতং সুবর্ণং বহুধর্ম্মভাবিতং
করোতি সাক্ষাদ্বরকুঙ্কুমপ্রভম্ ॥

নাগার্জ্জুন-বিরচিত রসরত্নাকর।

শতাব্দীতে রচিত। এই গ্রন্থে পারদ ও গন্ধক মিলিত করিয়া কজ্জলী ও রসপপ্পটিকা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে * এবং স্বর্ণ, পাবদ ও গন্ধক মিলিত করিয়া অন্ধমূষায় লঘুপুটে পাক করিয়া স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুত কারবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই শেষোক্ত সাধকেন্দ্র ভক্ষণ করিলে দিব্যদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রসরত্নাকর নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরচিত না হইলেও সপ্তম শতাব্দীর একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ হইলে সপ্তম শতাব্দীতে কজ্জলী, রসপর্পটিকা ও স্বর্ণসিন্দুর আবিষ্কৃত ও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। রসরত্নাকরের পর বৃন্দের সিদ্ধযোগে একভাগ গন্ধক ও অর্দ্ধভাগ পারদ মিশ্রিত করিয়া "রসামৃতচূর্ণ" প্রস্তুত করিবার বিধি আছে। বৃন্দ চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী কিন্তু অধ্যাপক রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে সিদ্ধযোগের একখানি সংস্করণে "রসামৃতচূর্ণের" উল্লেখ পান নাই, কেবল কাশ্মীর হইতে আনীত পাণ্ডুলিপিতে পাইয়াছেন। বৃন্দের পর চক্রপাণি একভাগ পারদ ও একভাগ গন্ধক মিলিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহা গলাইয়া রসপর্পটী প্রস্তুত করিয়াছেন। এই প্রস্তুত প্রণালী অনেকটা রসরত্নাকরে

---

* সূতকস্য পলং গৃহ্যং তূর্য্যাংশং সাক্ত্বকং বিষম্।
তৎসমং গন্ধকং শুদ্ধং চূর্ণংকৃত্বা বিনিক্ষিপেৎ॥
কৃত্বা কজ্জলিকামাদৌ পলং দত্বা চ গন্ধকং।
ঘৃতপক্কঞ্চ তচ্চূর্ণং পচেদায়সভাজনে॥
যাবদ্রবত্বমায়াতি তৎক্ষণাৎ তং বিনিক্ষিপেৎ।
পুটে বা কদলীপত্রে সিদ্ধং পপ্পটিকারসম্॥

উল্লিখিত প্রস্তুতপ্রণালীর সহিত মিলে। কিন্তু চক্রপানি লিখিয়াছেন "রসপর্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণিনা।" এক্ষেত্রে আমরা চক্রপাণিকে কজ্জলী ও রসপর্পটিকার আবিষ্কর্ত্তা না বলিয়া বৈদ্যকশাস্ত্রে উহাদের প্রচলয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। রসরত্নাকরের মতে উহাদের আবিষ্কর্ত্তা ও প্রয়োগকর্ত্তা নাগার্জ্জুন।

ইহা ভিন্ন এই রসরত্নাকর গ্রন্থে বিবিধ খনিজ (ores) পদার্থ হইতে ধাতু প্রস্তুতবিধি ও পঁচিশ প্রকার যন্ত্রের (যথা ভূধর যন্ত্র, দোলা যন্ত্র ইত্যাদি) উল্লেখ আছে। ধাতুপ্রস্তুত-বিধিগুলি নাগার্জ্জুনের সময় প্রচলিত থাকাই সম্ভব কিন্তু যন্ত্রগুলি নাগার্জ্জুনের পরে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ফলকথা নাগার্জ্জুনের প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের সম্যক আলোচনা না হইলে তাঁহার বৈজ্ঞানিক কার্য্যাবলীর সঠিক সংবাদ প্রদান করা অসম্ভব। কিন্তু এটা ঠিক বলিয়া মনে হয় যে নাগার্জ্জুন ধাতুর মারণ প্রক্রিয়া ও হীনধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবার প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত ও প্রচারিত করিয়া ভারতে প্রাচীন রসায়ণ শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন কয়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ের পর হইতে বিবিধ ধাতুর বিবিধ যৌগিক প্রস্তুত হইয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বিবিধ যন্ত্রাদিও উদ্ভাবিত হইয়াছে। তিনি ভারতে রসায়ন শাস্ত্রের যুগপ্রবর্ত্তক। এই মহাপুরুষের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াবলীর সম্যক তথ্য যাহাতে অবগত হইতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করিতে সুধীবৃন্দকে বিনীতভাবে আহ্বান করিতেছি। আমরা গেবার, প্যারাসেল্সস্, এভিসেনা, এগ্রিকোলার সহিত পরিচিত কিন্তু ভারতের নাগার্জ্জুন, চক্রপাণি প্রভৃতি প্রাচীন রাসায়ণিকগণ আমাদের অপরিচিত—এ জাতীয় কলঙ্ক আর কতদিন থাকিবে ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আর্য্যভট্ট।

অঙ্কশাস্ত্রে প্রচীন ভারত যে অনেক পরিমাণে জগতের শিক্ষাগুরু ছিল—এ কথা এখন অবিসম্বাদীরূপে গৃহীত হইয়াছে। দশমিক ভগ্নাংশের (Decimal system) আবিষ্কার সর্ব্বসম্মতি অনুসারে ভারতে হইয়াছিল। সংখ্যালিখনের (system of numeration) পদ্ধতিও ভারতীয় আবিষ্কার। এই ১, ২, ৩, প্রভৃতি সংখ্যাগুলি আরবীয়গণ গ্রহণ করিলে পর তাহা ক্রমশঃ ইউরোপে গৃহীত হয়। প্রাচীন গ্রীসদেশের সহিত প্রাচীন ভারত জ্যোতিষশাস্ত্রের শিক্ষাগুরু বলিয়া গৌবব করিতে পারে। আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্যের অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে গবেষণা শুধু ভারতের কেন, জগতের গৌরবের সামগ্রী। এই কয়জন মহাপুরুষের অগ্রণী আর্য্যভট্টের বিষয় এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

আর্য্যভট্ট বা আর্য্যভটের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে খুব কমই জানা গিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে তিনি ৩৫৭৭ কল্যব্দে বা ৩৯৮ শকে (৪৭৬ খৃঃ অঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আর্য্যভটিয়" বা "আর্য্যভট্টতন্ত্র" রচনা করেন। তিনি গ্রীকদিগের নিকট অন্দুবেরিয়স বা অদ্ বেরিয়স এবং আরবীয়গণের নিকট অর্জভর

নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুসুমপুর বা পাটলীপুত্র (আধুনিক পাটনা) তাঁহার বাসস্থান ছিল এবং এই স্থানেই তিনি "আর্য্যভটিয়" গ্রন্থ রচনা করেন।

"আর্য্যভটিয়" গ্রন্থ।

"আর্য্যভটিয়" গ্রন্থের পূর্ব্বেকার জ্যোতিষ শাস্ত্র বড়ই অনিশ্চিত, সেইজন্য আর্য্যভট্টকে এক হিসাবে আধুনিক ভারতীয় জ্যোতিষের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তাঁহার পূর্ব্বে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ব্যাসসিদ্ধান্ত প্রভৃতি অনেকগুলি সিদ্ধান্ত ছিল বলিয়া পরবর্ত্তী জ্যোতিষ গ্রন্থ সমূহে দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের অনেকগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন সিদ্ধান্ত পরবর্ত্তীকালে পরিবর্ত্তিত হইয়া এখনও বিদ্যমান আছে। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত সর্ব্বপ্রাচীন এবং আর্য্যভট্ট লিখিয়াছেন যে তিনি এই স্বায়ম্ভুব বা ব্রহ্মসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে বেশ জানা যাইতেছে যে তিনি প্রাচীন গ্রীকগণের গ্রন্থ হইতে কোনও বিষয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অভিমতগুলি ভারতীয় এবং গ্রীক-সংশ্রবশূন্য। এই গ্রন্থখানি চারিভাগে বিভক্ত গীতিকাপাদ, গণিতপাদ, কালক্রিয়াপাদ এবং গোলপাদ। গণিতপাদে পাটীগণিত এবং বাকি তিন ভাগে জ্যোতিষ ও গোলগণিত আলোচিত হইয়াছে।*

---

* খৃষ্টপূর্ব্ব দুই তিন সহস্র বৎসরের ভারতীয় জ্যোতিষীক জ্ঞান সম্বন্ধে Brennand's Hindu Astromony দেখুন।

পৃথিবী গোলাকার ও শূন্যে অবস্থিত।

পৃথিবীর আকারের স্বরূপ নির্ণয় করিবার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই মানব মনকে উৎসাহিত করে। সাধারণের চক্ষে পৃথিবী সমতলক্ষেত্র কিন্তু প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। ঋগ্বেদে কোনও কোনও সূক্তে পৃথিবীর গোলত্বের আভাস পাওয়া যায়, এমন কি পৃথিবী যে অবলম্বন শূন্য হইয়া শূন্যে অবস্থিতি করিতেছে তাহার সূচনাও ঋগ্বেদে মিলে। আর্য্যভট্ট অবশ্য পৃথিবীর গোলত্ব (Sphere) ও অবলম্বন শূন্য হইয়া আকাশে অবস্থিতি—এই দুইই স্বীকার করিয়াছেন। পৃথিবীর শূন্যে অবস্থিতি স্বীকার করিলে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, যদি বাস্তবিকই পৃথিবী নিরাবলম্বন, তবে বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, পাহাড় পর্ব্বত পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়া আছে কিরূপে। তাহার উত্তরে আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন যে গোল কদম্ব পুষ্পের উপরের গ্রন্থিগুলি যেমন পুষ্পের উপর আটকাইয়া আছে, সেইরূপ গোল পৃথিবীর উপর জলজ স্থলজ পদার্থ অবস্থান করিতেছে।* বরাহ, ভাস্কর প্রভৃতি পরবর্ত্তী সকল জ্যোতিষীই পৃথিবীর গোলত্ব ও শূন্যে অবস্থিতি স্বীকার করিয়াছেন। একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে —পৃথিবী যদি শূন্যে অবস্থিত, তবে পড়িয়া যায় না কেন? তাঁহার সুন্দর উত্তর ভাস্কর দিয়াছেন "পৃথিবীর চারিদিকেই সমান আকাশ, উহা পড়িবে কোথায়?"

---

* যদ্বৎ কদম্বপুষ্পগ্রন্থিঃ প্রচিতঃ সমন্ততঃ কুসুমৈঃ।
তদ্বদ্ধি সর্ব্বসত্ত্বজলজৈঃ স্থলজৈশ্চ ভূগোলঃ॥

পৃথিবীর আবর্ত্তন আবিষ্কার।

ভারতে আর্য্যভট্ট ভূভ্রমণের আবিষ্কারক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন যে বেদেও ভূভ্রমণ সূচিত হইয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্যরূপে আর্যভট্টই উহার আবিষ্কারক বলিয়াই স্বীকৃত হন। আর্য্যভট্টের পরবর্ত্তী জ্যোতিষীগণ কেহই ভূভ্রমণ স্বীকার করেন নাই। অতএব এরূপ মনে হয় যে ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট একমাত্র ভূভ্রমণ আবিষ্কর্ত্তা ও পরিপোষক। গ্রীসদেশে ভূভ্রমণবাদ অতি প্রাচীনকালে একবার আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহা স্বীকার না করাতে উহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পিথাগোরাস * (খৃষ্টপূর্ব্ব

---

* "ঢাকা রিভিউ ও সাম্মলনে" একজন লেখক লিখিয়াছেন (১৩১৮, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, পৃঃ ২৬০)—"গ্রীসদেশবাসী পিথাগোরস প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত আর্য্যভট্টের মত ভারত হইতে নিয়া স্বদেশে প্রচার করেন।" বলা বাহুল্য পিথাগোরস আর্য্যভট্টের প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন "আর্য্যসিদ্ধান্তকার-গণের মধ্যে আর্য্যভট্টই প্রথমে দিবারাত্র ভেদের কারণ স্বরূপ পৃথিবীর আবর্ত্তন স্বীকার করিয়াছিলেন। ইউরোপে শকের পঞ্চাদশ শতাব্দীতে কোপার্ণিক প্রথমে ভূভ্রমণবাদ যথোচিত প্রকাশ করেন। তাঁহার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভট সেই মত আবিষ্কার করিয়াছিলেন"। বলাবাহুল্য কোপার্নিকাসের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পিথাগোরাস পৃথিবীর আবর্ত্তন আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এরিষ্টারকস পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন ও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণের কথা জানিতেন। কোপার্নিকাসের সহিত আর্য্যভট্টের তুলনা চলে না। কোপার্নিকস শুধু পৃথিবী কেন, সমস্ত গ্রহগণের সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ বৃত্তান্ত আবিষ্কার করিয়া আধুনিক জ্যোতিষের জন্ম দিয়া গিয়াছেন। আর্য্যভট্টের তুলনা পিথাগোরাসের সহিত চলে।

পঞ্চম পতাব্দী) সর্ব্বপ্রথম স্বীকার করেন যে পৃথিবী অচলা নহে, সচলা। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে উহা সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাঁহার পর এরিষ্টারকস (খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী) আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী এক বৎসরে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, এবং স্বীয় অক্ষের উপরেও ঘুরিতেছে বলিয়া দিবারাত্র হইয়া থাকে। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সকলেই অগ্রাহ্য করেন এবং এরিষ্টারকসের জন্মের প্রায় আঠার সাত বৎসর পরে সুবিখ্যাত জ্যোতিষী কোপার্ণিকাস পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগণের সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণের কাহিণী পুনরায় প্রচার করেন। আর্য্যভট্টের সময় গ্রীসদেশে ভূভ্রমণবাদ একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য আর্য্যভট্টকে আমরা ভুভ্রমণবাদের একজন মৌলিক আবিষ্কারক বলিয়া অনায়াসে স্বীকার করিতে পারি। আর্য্যাভট্ট বলিতেছেন "চলা পৃথ্বীস্থিরা ভাতি" অর্থাৎ পৃথিবী স্থির বোধ হইলেও বস্তুতঃ উহা সচলা। তিনি আরও বলিতেছেন "এক চতুর্যুগে (৪৩২০০০০ সৌরবর্ষে) পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে গতি সম্ভূত ভগণ (rotation) ১৫৮২২৩৭৫০০ বার, অর্থাৎ পৃথিবী ১৫৮২২৩৭৫০০ বার ঘুরিয়া আসিলে (অথবা অত দিনে) এক চতুর্যুগ বা ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ হয়। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে আর্য্যভট্ট জানিতেন যে পৃথিবী একবার স্বীয় অক্ষের উপর ঘুরিলে এক দিনমান হয় এবং এক চতুর্যুগে পৃথিবী অতবার স্বীয় অক্ষের উপর ঘোরে। উপরোক্ত গণনায় পৃথিবী যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহা অনুমিত হয় না। উপরন্তু লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি পরবর্ত্তী জ্যোতিষীরা আর্য্যভট্টের মত খণ্ডনকালে স্বীয়

অক্ষের উপর পৃথিবীর আবর্ত্তনেরই উল্লেখ করিয়াছেন, সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর ভ্রমণের উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে জানা যাইতেছে যে পিথাগোরাসের মত আর্য্যভট্ট অক্ষের উপর পৃথিবীর আবর্ত্তনের কথা জানিতেন, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর ভ্রমণের কথা জ্ঞাত ছিলেন না।

আর একস্থলে আর্য্যভট্ট এই পৃথিবীর পরিভ্রমণের কথা বেশ সুন্দর উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "যেমন গতিশীল নৌকার আরোহী তীরস্থিত অচল বৃক্ষাদিকে উল্টাদিকে যাইতে দেখে, সেইরূপ লঙ্কাতে (পৃথিবীর গতির জন্য) স্থির নক্ষত্রদিগকে সমবেগে পশ্চিম দিকে যাইতে দেখা যায়।" (১) নক্ষত্রবর্গের পশ্চিমদিকে গতি স্ফুটগতি (apparent motion), বস্তুতঃ পৃথিবীই পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছে এবং সেই পরিভ্রমণের দরুণ নক্ষত্রবর্গকে পশ্চিমদিকে যাইতে দেখা যায়। এখন যেমন গ্রীন্‌উইচ (Greenwich) এর সময় গণনার জন্য ব্যবহৃত হয় আর্য্যভট্ট লঙ্কার সময় সেইরূপ ব্যবহার করিতেন।

আরও কয়েকটি শ্লোকে আর্য্যভট্ট পৃথিবীর পরিভ্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল। পরবর্ত্তী কালে লল্ল, শ্রীপতি, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহ প্রভৃতি জ্যোতিষীগণ তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়া তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লল্ল আর্য্যভট্টের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু শিষ্য গুরুর সিদ্ধান্ত মানেন নাই। তিনি পৃথিবীর পরিভ্রমণের বিরুদ্ধে অনেকগুলি আপত্তি উত্থাপিত

(১) অনুলোমগতি নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥

করিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য নিম্নে কতকগুলির নমুনা প্রদত্ত হইল ঃ—

(ক) যদি পৃথিবীই ঘোরে তবে পক্ষীরা উড়িয়া গিয়া আবার নিজেদের বাসায় ফিরিয়া আইসে কি প্রকারে ?

(খ) পৃথিবী ঘুরিলে বাণ উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলে উহা স্বস্থানে ফিরিয়া আসিত না, কারণ বাণের পতনকালের মধ্যে পৃথিবী অনেকটা পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাইবে।

(গ) পৃথিবী ঘুরিলে আমরা মেঘকে কখনও পূর্ব্বদিকে যাইতে দেখিতাম না।

(ঘ) যদি স্বীকার করি যে পৃথিবী আস্তে আস্তে চলিতেছে, তাহা হইলে আর্য্যভট্টের মতে উহা একদিনে একবার কিরূপে ঘুরিয়া আসে ?

শ্রীপতি, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহ প্রভৃতি সকলেই এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিয়া পৃথিবীর আবর্ত্তনবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইউরোপে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে যখন কোর্পানিকাস ভূভ্রমণবাদ পুনঃপ্রচারিত করেন তখনও এইরূপ যুক্তির দ্বারা তাঁহার মতও প্রথমে অগ্রাহ্য হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী টাইকোব্রাহি লল্লের ন্যায় বুঝিতে পারেন নাই কেন উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত গোলাকে পশ্চিমদিকে পড়িতে দেখা যায় না। পাঠক দেখিতে পাইতেছেন এক কথায় এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় পৃথিবীর সহিত বায়ুমণ্ডলও ঘুরিতেছে—এই একটা বিষয় কাহারও মাথায় প্রবেশ করে নাই; করিলে এই সকল আপত্তি আদৌ উত্থাপিত হইতে পারিত না। পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন পৃথিবীর সহিত বায়ুমণ্ডলও

ঘোরাতে লল্ল প্রমুখ জ্যোতিষীদের সকল আপত্তির খণ্ডন হইয়াছে।

এই ভূভ্রমণবাদ ভিন্ন আর্য্যভট্ট আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষিক বিষয়ে মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নক্ষত্রগণের দীপ্তির বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে গোলাকার পৃথিবী, গ্রহ ও নক্ষত্রবর্গ সূর্য্যের দ্বারা আলোকিত হয়; তাহাদের যে অর্দ্ধাংশ সূর্য্যের দিকে থাকে সেই অংশ দীপ্তি পায়, বাকি অর্দ্ধাংশ নিজের ছায়ায় অন্ধকাবাবৃত। বৈদিক ঋষি-গণও জানিতেন যে চন্দ্র সূর্য্যতেজে দীপ্তিশালী।

গ্রহগণের কক্ষা (orbit) সম্বন্ধে আর্য্যভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে শনি (saturn), বৃহস্পতি (jupiter), মঙ্গল (mars), সূর্য্য, শুক্র (venus), বুধ (mercury) ও চন্দ্রের কক্ষা পর পর অবস্থিত ও সকলের অধোভাগে পৃথিবীর কক্ষা। ইহাতে জানা যাইতেছে যে আর্য্যভট্ট জানিতেন না যে সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহগণ ঘুরিতেছে।

আর্য্যভট্ট গ্রহণের (eclipse) প্রকৃত কারণ জানিতেন বলিয়া মনে হয়। বরাহ আর্য্যভট্টের কিছু পরে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি গ্রহণের প্রকৃত আধুনিক কারণ সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং গ্রহণ সম্বন্ধে পৌরাণিক কল্পনাকে খণ্ডন করিয়াছেন।

আর্য্যভট্ট কেবল জ্যোতিষীই ছিলেন না, তিনি একজন প্রগাঢ় অঙ্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতও ছিলেন। তিনি পাটীগণিত, বীজগণিত (Algebra) ও ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন।

সংখ্যানির্দ্দেশ (Notation)

আর্য্যভট্টের সময়ে ভারতে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা-নির্দ্দেশক বর্ণ আবিষ্কৃত হয় নাই। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে এই সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা প্রচলিত হয়। সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব্বেও কয়েকটি সংখ্যাবাচক বর্ণ ভারতে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন আরবীয় ব্যবসায়ীরা অষ্টম শতাব্দীতে এই ভারতীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আর্য্যভট্টের সময় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা আবিষ্কৃত হয় নাই, তিনি ক, খ, গ প্রভৃতি বর্ণমালা সংখ্যানির্দ্দেশকল্পে ব্যবহার করিতেন। এই বর্ণমালা ব্যবহার করিয়াও তিনি সহজে বড় বড় সংখ্যা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এস্থলে ভারত হইতে কেমন করিয়া সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা ইউরোপে গৃহিত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আরবীয় অঙ্কশাস্ত্রবিৎগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ বেন মুসা (৯০০ খৃঃ অঃ) সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা ব্যবহার করেন এবং ক্রমশঃ অপর অপর আরবীয় বৈজ্ঞানিকেরাও তাহা গ্রহণ করেন। প্রাচীন ইউরোপে I II III প্রভৃতি রোমীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা প্রথমে ব্যবহৃত হইত কিন্তু ১০০০ খৃষ্টাব্দে রিমস্ প্রদেশের আর্কবিশপ সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ধর্ম্মযাজক গারবার্ট এবং তাঁহার পরে রোমের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক পোপ দ্বিতীয় সিল্‌ভেস্‌টার আরবীয়গণের নিকট হইতে হিন্দুদের সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা গ্রহণ করিয়া ইউরোপে প্রচলিত করেন। ১২০২ খৃষ্টাব্দে পিসার সুপ্রসিদ্ধ লিওনার্ডো

তাঁহার গ্রন্থে প্রথম এই সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা ব্যবহার করেন। এখনও এই বর্ণমালাই জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত, পূর্ব্বেকার রোমীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা ক্বচিৎ বিশেষ কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোমীয় বর্ণমালায় হিসাব রাখা বা অঙ্ককসা অপেক্ষা ভারতীয় বর্ণমালায় অঙ্ককসা সহজ বলিয়া উহা সর্ব্বত্রই গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে ভারতীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা হইতে কিরূপে সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাচীন আরবীয় ও মধ্যযুগের ইউরোপীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা গঠিত হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইল। *

দেবনাগর (৯৫০ খৃঃ অঃ)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
আরবীয় (১১০০ খৃঃ অঃ)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
জার্ম্মান (১৩৮৫ খৃঃ অঃ)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ইটালিয় (১৪০০ খৃঃ অঃ)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ইংরাজি (১৪৮০ খৃঃ অঃ)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
স্কচ বা ফরাসী (১৪৮২ খৃঃ অঃ)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* এই তালিকাটি Ball's History of Mathematics নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বীজগণিত (Algebra)

আর্য্যভট্ট প্রাচীন ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক বীজগণিত-প্রণেতা। তিনি অনেকগুলি বীজগণিত সম্বন্ধীয় নূতন আবিষ্কার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ইউরোপে ডাইওফেন্টস বীজগণিতের প্রাচীন রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার আবির্ভাবকাল ঠিক জানা নাই—সম্ভবতঃ চতুর্থ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি এলেক্জেন্দ্রিয়াবাসী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ গ্রীক ছিলেন না। তাঁহার গ্রন্থ অনেকদিন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল এবং প্রায় ৯৬০ খৃষ্টাব্দে ডাইওফেন্টাসের বীজগণিত আরবী ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। ডাইওফেন্টাসের গ্রন্থ আর্য্যভট্টের সময় বা তাঁহার অনেক পর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল এবং সেইজন্য আর্য্যভট্টকে আমরা বীজ-গণিতের একজন মৌলিক আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। কোলব্রুক প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আরবীয় ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বোগ্দাদের আল মামুন, হারুণ আল রসিদ, আল মামুদ, এবং আল মতাদেদ এই চারিজন বাদসাহের আমলে প্রায় ১৫০ বৎসর ধরিয়া (৭৫৪ হইতে ৯০৪ খৃষ্টাব্দ) প্রাচীন নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। এই সময়ে আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি ভারতীয় জ্যোতিষীগণের গ্রন্থও আরবী ভাষায় অনূদিত এবং পঠিত হয়। ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ আল মানসুরের সময় ভারতীয় জ্যোতিষীগণ বাদসাহের দরবারে আহুত হইয়াছিলেন। এইরূপে আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি ভারতীয়

জ্যোতিষীগণের বীজগণিত সম্বন্ধে জ্ঞানও আরবীয়গণের নিকট পঁহুছে। সেইজন্য আরবীয় বীজগণিত ভারতীয় বীজগণিতের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। ৯০০ খৃষ্টাব্দে বেন মুসা আরবীয়গণের মধ্যে প্রথম বীজগণিত রচনা করেন। এই আরবীয় বীজগণিতবেত্তাগণের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া পিসার লিইনার্ডো ১২০২ খৃষ্টাব্দে বীজগণিতের বীজ ইউরোপে প্রোথিত করেন; সেই বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ ক্রমশঃ ফলেফুলে পরিণত হয়। যেমন সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালার জন্য পৃথিবী ভারতের নিকট ঋণী, সেইরূপ বীজগণিত সম্বন্ধেও ইউরোপ প্রাচীন আরবীয় বীজগণিতবেত্তাগণের মধ্য দিয়া ভারতের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি ভারতীয় বীজগণিতবেত্তাগণের মধ্যে আর্য্যভট্ট সর্ব্বপ্রাচীন। তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে কুট্টকবিধির (Algebraic analysis) আবিষ্কর্ত্তা। তিনি বর্ণাত্মক সমীকরণ (quadratic equation) জানিতেন এবং—

$$১+২+৩+৪+\cdots\cdots$$

$$১^{২}+২^{২}+৩^{২}+৪^{২}+\cdots\cdots$$

$$১^{৩}+২^{৩}+৩^{৩}+৪^{৩}+\cdots\cdots$$

এই তিন শ্রেণীর যোগফল কসিয়াছেন। তাহা ভিন্ন তিনি বীজগণিতের আরও অনেকগুলি সমীকরণের অঙ্কফল দিয়াছেন।

ত্রিকোণমিতি (Trigonometry)

ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধেও আর্য্যভট্ট প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষীগণের অগ্রণী এবং প্রাচীন ইউরোপীয় ও আরবীয়-গণের মধ্যে একজন প্রাচীন গ্রন্থকার। ত্রিকোণমিতিতে তিনি অনেকগুলি কোণের (angle) জ্যার (sine) একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দ্বিগুণিত কোণের অর্দ্ধ পূর্ণজ্যাকে (semichord of double the angle) জ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম বৃত্তপাদের (first quadrant of a circle) ৩$\frac{৩}{৪}$ ডিগ্রি বা তাহার গুণিত কোণের জ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি এই তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনি ৯০ ডিগ্রির জ্যা ৩৪৩৮ বলিয়া স্থির করেন। এই গণনায় তিনি $\frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}}$ এর সংখ্যা নিশ্চয়ই ৩·১৪১৬ ধরিয়াছিলেন, নহিলে এই অঙ্ক ঠিক হয় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এই সংখ্যা ৩·১৪১৫৯ বলিয়া নির্ণয় করেন। তিনি পরিশ্রম-লাঘবমানসে ভূপরিধি গণনাকালে এই সংখ্যাকে $\sqrt{১০}$ বা ৩·১৬২৩ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, কিন্তু ঠিক সংখ্যা যে ৩·১৪১৬ তাহাও যে তিনি জানিতেন তাহা উপরোক্ত অঙ্ক হইতে জানা যায়। ইহা ভিন্ন ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি অঙ্ক তিনি কসিয়াছিলেন। জ্যামিতি (Geometry) সম্বন্ধে তাঁহার অনেকগুলি প্রমাণে ভুল আছে। বস্তুতঃ জ্যামিতির জ্ঞান প্রাচীন গ্রীসদেশে যেমন উন্নত ছিল, ভারতে সেরূপ ছিল না।

ব্রহ্মগুপ্ত, ব্যরাহমিহির ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষী ও অঙ্কশাস্ত্রবিদেরা আর্য্যভট্টের পরবর্ত্তী। তাঁহাদের কর্ম্মময় জীবনের পরিচয় দিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধে তাঁহাদের অগ্রণীর আবিষ্কার কাহিনীর কতক আলোচনা করিবার সুযোগ পাওয়াতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ডারুইন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যত বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল একহিসাবে ডারুইন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এমন অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁহারা সারাজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কাটাইয়াছেন, ফলও যথেষ্ট লাভ করিয়াছেন কিন্তু সেগুলি তাদৃশ কার্য্যকরী নহে। আবার এরূপ অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা আছে যাহা স্বল্পায়াসে সিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু তাহার ফল বহুদূরগামী। ডারুইনের বৈজ্ঞানিক সাধনা এক দিকে যেমন বহু আয়াসসাধ্য অপর দিকে তাঁহার আবিষ্কারগুলির প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত। উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বহুশাস্ত্র তাঁহার আবিক্রিয়ার ফলে নূতন আলোক লাভ করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে যে সকল বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কাহারও আবিক্রিয়া এত অধিক পরিমাণে ফলপ্রসূ হয় নাই বলিয়া ডারুইন তাঁহাদের মধ্যে অবিসম্বাদীরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

চার্লস রবার্ট ডারুইন ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী শ্রুবেরী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রবার্ট ওয়ারিং ডারুইন। তিনি একজন সুচিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ সুপ্রসিদ্ধ ইরাসমাস ডারুইন।

ইনিও একজন বড় ডাক্তার ছিলেন এবং অনেক গ্রন্থ ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ডারুইনের বয়স যখন মাত্র আট বৎসর তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। এখন হইতে তাঁহার লালন পালন ও শিক্ষার ভার তাঁহার বড় ভগিনীগণের উপর পড়ে। ডারুইনের ভ্রাতা ভগিনী ছিলেন পাঁচজন, তিনি সকলের কনিষ্ঠ। ডারুইন পিতাকে বড় ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁহার কথা অনেক স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৮১৮ সালে তিনি স্রুবেরী স্কুলে প্রেরিত হন। এই স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন ডাক্তার বাট্‌লার; ইনি পরে লিচফিল্ডের বিশপ হন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে ডারুইন তাঁহার মত চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। সেইজন্য ১৮২৫ সালে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। চিকিৎসাবিজ্ঞান তাঁহার অদৌ ভাল লাগিল না। কিন্তু এইখানে তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের কার্য্যের প্রথম সূচনা আরম্ভ করিবার তিনি সুযোগ পাইয়াছিলেন। অধ্যাপক ডাক্তার গ্রাণ্টের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়াতে তাঁহার সঙ্গে ডারুইন সমুদ্রতীরস্থ জীব জন্তুর নমুনা সংগ্রহ করিতে যাইতেন। এইরূপে ১৮২৬ সালে তিনি প্লিনিয়ান সোসাইটিতে দুইটি মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এবং এই প্রবন্ধে "চার্লস ডারুইন কর্ত্তৃক ধৃত" এই কথাগুলিতে যে তিনি কত আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার একখানি পত্রে অবগত হওয়া যায়।

দুই বৎসর এডিনবরাতে থাকার পর তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের সংকল্প পরিত্যাগ কারন। তাহার পর ধর্ম্মযাজকের কার্য্য তাঁহার জন্য অবধারিত হয়। সেই জন্য তিনি ১৮২৭ সালে

বিখ্যাত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ক্রাইষ্ট চার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হন। এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হেন্সলোর সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণভাবে অন্য দিকে পরিচালিত হইয়া যায়। অধ্যাপক হেন্সলো প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান, পরে খনিজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, এবং ছাত্রদিগের সহিত খুব ঘনিষ্টভাবে মিশিতে পারিতেন। সেইজন্য ছাত্র-দিগের মনের উপর তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। ডারুইন হেন্সলোর প্রিয়পাত্র হইলেন, এমন কি বেড়াইতে যাইবার সময়ও হেন্সলো তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতেন। সেইজন্য ডারুইনের সহপাঠিরা তাঁহাকে "হেন্সলোর সহচর" বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। ডারুইনের মনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পাঠের আগ্রহ জন্মাইয়া দিবার জন্য অধ্যাপক হেন্সলোর নিকট সমস্ত জগৎ বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁহার সংসর্গ না পাইলে ডারুইন ডারুইন হইতে পারিতেন কি না সন্দেহের বিষয়। ১৮৩১ সালে হেন্সলোর পরামর্শে ডারুইন ভূবিদ্যা পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ভূবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে হেন্সলোর সহিত ওয়েলস্ প্রদেশে যাত্রা করেন। এই ভূবিদ্যা বিষয়ক পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তীকালে তাঁহার বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল।

"বিগল্"এ সমুদ্র যাত্রা।

তিনি শিকার বড় ভাল বাসিতেন। এক দিন শিকার হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অধ্যাপক হেন্সলোর একখানি

পত্র পাইলেন। এই পত্রে অধ্যাপক হেন্স্‌লো তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে, "বিগ্‌ল" নামক জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা সার্ভে করিতে যাইতেছে এবং জাহাজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন ফিজরয় সঙ্গে লইবার জন্য একজন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের অন্বেষণ করিতেছেন। তিনি ডারুইনকে এই কার্য্যের যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করেন এবং ডারুইনকে এই পদ গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন। ডারুইন এই পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণের এই সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার আপত্তির কারণ এই যে, সমুদ্রযাত্রা ডারুইনের ধর্ম্ম-যাজকের পদোপযুক্ত পাঠের বিঘ্ন উপস্থিত করিবে। অবশেষে তাঁহার খুল্লতাতের সবিশেষ অনুরোধে তাঁহার পিতা সম্মতি প্রদান করিতে বাধ্য হন। পিতার সম্মতি পাইয়া ডারুইন ১৮৩১ সালে ২২এ ডিসেম্বর তারিখে বিগ্‌ল জাহাজে সমুদ্র-যাত্রা করেন। তাঁহার মাহিনার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। কাপ্তেন সাহেবের ঘরেই তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

এই সমুদ্রযাত্রা ডারুইনের পরবর্ত্তীকালের শিক্ষা ও সাধনার প্রধান সহায়ক হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হম্‌বোল্ট সাহেবের "আত্মজীবনী" পাঠ করিয়া দেশ ভ্রমণের ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিবার আগ্রহ তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। পৃথিবী ভ্রমণের এই সুবিধাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য তাঁহার সমধিক বর্দ্ধিত হইল। এই সময়কার তাঁহার চিঠি পত্রে জানা যায় যে বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে তিনি মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত

হইয়া যাইতেন, নানা দেশের পশুপক্ষী, তরুবৃক্ষরাজি, মৃত্তিকা প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া এতই আনন্দ লাভ করিতেন যে সময় সময় রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রাই হইত না। তিনি বিগ্‌ল্‌ এ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কোনও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু স্বভাবের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া পাঁচ বৎসর পরে যখন দেশে ফিরিলেন তখন তিনি ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায় সম্পূর্ণ পারদর্শী। দক্ষিণ আমেরিকার বিবিধ জীবকঙ্কাল (fossils), গ্যালাপেগো দ্বীপের বিবিধ পক্ষী, সমুদ্রের মধ্যস্থিত প্রবালস্তূপ (coral reefs) প্রভৃতি স্বচক্ষে দর্শন ও পরীক্ষার পর তাঁহার মনে ক্রমবিবর্ত্তনবাদ (theory of evolution) ক্রমশঃ সুস্পষ্টাকারে প্রতীয়মান হইতেছিল। ১৮৩৬ সালে ৬ই অক্টোবর তারিখে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন্। দেশে ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মযাজকের কার্য্য করিবার কল্পনা স্বতই ত্যক্ত হইল। আমেরিকা হইতে তিনি নানা প্রাণীর কঙ্কাল এবং খনিজ প্রভৃতি আনিয়াছিলেন, এখন এইগুলি শ্রেণীবিভাগ করিতে এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইলেন। সরকারি তহবিল হইতে এক হাজার পাউণ্ড (পনের হাজার টাকা) প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য বৈজ্ঞানিক-গণের সহায়তায় গত সমুদ্রযাত্রার ফলস্বরূপ আহৃত প্রাণিবিদ্যা ও ভূবিদ্যা বিষয়ক অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। ১৮৩৮ হইতে ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত তিনি "জিওলজিক্যাল সোসাইটির" সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূবিদ্যা বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ এই সভায় পঠিত হইয়াছিল।

১৮৩৯ সালে ২৯এ জানুয়ারী তিনি বিবাহ করেন। বিবাহ

করিয়া প্রায় তিন বৎসর লণ্ডন সহরে বাস করিয়াছিলেন, তাহার পর লণ্ডন হইতে ষোল মাইল দূরবর্ত্তী ডাউন নামক একটি নিভৃত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে বাস করিতে যান। এই স্থানেই তিনি বরাবর ছিলেন এবং তাঁহার যাবতীয় গবেষণা এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। ডারুইনের সকল গবেষণার পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভবপর নহে; কয়েকটি স্থূল বিষয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রাচীন ভারতের ক্রমবিবর্ত্তনবাদ।

ডারুইনের ক্রমবিবর্ত্তনবাদের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতের ক্রমবিবর্ত্তনবাদের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ক্রমবিবর্ত্তনবাদ দার্শনিক অনুমানরূপে প্রাচীন গ্রীস দেশে ও ভারতে প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনার স্থান এখানে নাই, তবে মনে হয় যে, প্রাচীন ভারতে এই ক্রমবিবর্ত্তনবাদ দুইটি অনুমানে বেশ সুস্পষ্ট—প্রথম দশাবতার বাদ, দ্বিতীয় আত্মার পরাবর্ত্তনবাদ (transmigration of soul)। এই দশাবতারবাদের মধ্যে ক্রমবিবর্ত্তনের একটা দিক আছে, তাহা অনেকে বড় একটা লক্ষ্য করেন না। এই দশাবতারবাদে বলা হইতেছে যে, ভগবান মানবরূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে প্রথমে মৎস্য (জলজ) পরে কূর্ম্ম, (জলজ ও ভূচর) বরাহ, (পশু) নরসিংহ (অর্দ্ধ মানব), ক্রমশঃ বামন (ক্ষুদ্রাকার মানব) রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ক্রমে বামনাকার ছাড়িয়া পরশুরাম অর্থাৎ যুদ্ধোপজীবী আদিম মানুষে (primitive man) পরিণত হন। পূর্ণ মানবধর্ম্মা-

বলম্বী হইতেছেন রামচন্দ্র। ক্রমবিবর্ত্তনবাদ স্বীকার না করিলে এই দশাবতারবাদের প্রচলন ভারতে আদৌ সম্ভবপর হইত না।

প্রাচীন ভারতে ক্রমবিবর্ত্তনবাদের অস্তিত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ —আত্মার পরিভ্রমণ বা জন্মান্তরবাদ। এই জন্মান্তরবাদ যোনিভ্রমণবাদে পরিণত হইয়াছিল। এই যোনিভ্রমণবাদে দেখিতে পাই যে, আত্মা মানবদেহে অধিষ্ঠান করিবার পূর্ব্বে বহু যোনি ভ্রমণ করিয়াছে। অনেক পুরাণে এই যোনিভ্রমণবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে আছে :—

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকং।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশলক্ষং পশুনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য তৎ কর্ম্মানি সাধয়েৎ॥ *

---

* এই শ্লোকটি ঐভাবে বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ হইতে শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত "The Economic Botany of India"তে উদ্ধৃত হইয়াছে (৩৩পৃষ্ঠা); কিন্তু "বিশ্বকোষে" "যোনি" শীর্ষক শব্দের অর্থ প্রদানকালে ঐ শ্লোকটী নিম্নলিখিতভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে।—

জলজা নবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিনাং দশলক্ষকম্॥
ত্রিংশল্লক্ষানি পশবশ্চতুর্লক্ষানি মানুষাঃ।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ॥

এই পাঠে "বানরাঃ" শব্দ না থাকিলেও সৃষ্টির ক্রমবিবর্ত্তন বেশ ভালরূপই সূচিত হইয়াছে। "বিশ্বকোষ"কার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আরও কয়েকখানি গ্রন্থ হইতে এই যোনিভ্রমণবাদমূলক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন যথা :—

মানবজন্ম লাভ করিবার পূর্ব্বে প্রথমে স্থাবর (বৃক্ষাদি), পরে ক্রমশঃ জলজ (মৎস্যাদি), কূর্ম্ম (জলচর ও স্থলচর), পক্ষী ও পশু জন্মলাভ করিতে হয়। তৎপরে বানরজন্ম এবং বানরজন্মের পরই মানবজন্ম। এই যোনিভ্রমণবাদে প্রথমে বৃক্ষ, ক্রমশঃ জলজ, উভজ, পক্ষী, পশু, বানর ও সর্ব্বশেষে মানবের উৎপত্তির বিষয় লক্ষ্য করিয়া কেহই প্রাচীন ভারতে ক্রমবিবর্ত্তনের অস্তিত্বের উপর সন্দেহ করিতে পারিবেন না। শুধু ইহাই নহে—আধুনিক ভূবিদ্যাবিশারদেরা পরীক্ষার দ্বারা প্রাচীন জীবকঙ্কালের (fossil) ক্রমবিবর্ত্তনের যে বিভিন্ন স্তর নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার পৌর্য্যাপৌর্য্য উল্লিখিত যোনিভ্রমণ-বাদের পৌর্য্যাপৌর্য্যের সহিত মিলে। ভূবিদ্যাবিদেরা দেখিতে পাইয়াছেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন যুগের পর্ব্বতসমূহে

স্থাবরাস্ত্রিংশল্লক্ষশ্চ জলজা নবলক্ষকঃ।
কৃমিজা দশলক্ষশ্চ রুদ্রলক্ষশ্চ পক্ষিণঃ॥
পশবো বিংশলক্ষশ্চ চতুর্লক্ষশ্চ মানবাঃ।
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে॥
(কর্ম্মবিপাক)

চতুরশীতি লক্ষানি চতুর্ভেদাশ্চ জন্তবঃ।
অণ্ডজা স্বেদজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ॥
একবিংশতিলক্ষানি হ্যণ্ডজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
স্বেদজাশ্চ তথৈবোক্তা উদ্ভিজ্জাস্তৎপ্রমাণতঃ॥
জরায়ুজাশ্চ তাবন্তো মনুষ্যাদ্যাশ্চ জন্তবঃ।
সর্ব্বেষামেব জন্তুনাং মানুষত্বং সুদুর্লভম্॥
(গরুড়পুরাণ)।

কেবল মাত্র জলজ জন্তুরই কঙ্কাল (যথা মৎস্যের কাঁটা) দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন প্রকার উন্নত জীবের অস্তিত্ব তথায় মিলে না। ইহা অপেক্ষা আধুনিক যুগের পর্ব্বতসমূহে মৎস্যের সঙ্গে বেঙ কুম্ভীরের মত উভচর (জলচর ও ভূচর) জন্তুর কঙ্কালও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী যুগের পর্ব্বতসমূহে পাখাবিশিষ্ট জন্তু ও ক্রমশঃ পক্ষীর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আধুনিক কালের মৃত্তিকার স্তরে ক্ষুদ্র চতুষ্পদ পশু, ক্রমশঃ বৃহৎ চতুষ্পদ জন্তুর দেহাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই সকল চতুষ্পদ জন্তু আধুনিক অশ্ব, গণ্ডার প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তু হইতে বহু পরিমাণে ভিন্ন। সমকালীন মৃত্তিকাস্তরের ভিতর বানরের হাড় প্রথম পাওয়া গিয়াছে। ভূবিদ্যাবিদ্‌গণের এই পরীক্ষামূলক আবিষ্কার ভারতে যোনিভ্রমণ-বাদের পৌর্য্যাপৌর্য্য সমর্থন করিতেছে।

ক্রমবিবর্ত্তনের সমর্থক পরীক্ষামূলক তথ্য নিরূপণ।

ডারুইনের ক্রমবিবর্ত্তনবাদ প্রচারের পূর্ব্বে অনেক পরীক্ষা-মূলক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যাহাকে ভিত্তি করিয়া ডারুইন তাঁহার মত প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ভূবিদ্যাবিদ্‌গণের জীবকঙ্কাল আবিষ্কার ডারুইনের ক্রমবিবর্ত্তনবাদ প্রচারকল্পে সহায়ক হইয়াছিল। এমন অনেক জন্তুর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, সে সকল জন্তু এককালে জীবিত ছিল কিন্তু এখন পৃথিবীতে নাই। এক

প্রকার "পক্ষী-সরীসৃপ" আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহার আকৃতি পক্ষীর মত কিন্তু সরীসৃপের মত দাঁত ও মাড়ি আছে। আমেরিকায় একপ্রকাব অশ্বকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে—উহার খুর বিভক্ত, আর এক প্রকার অশ্বের খুর সম্পূর্ণরূপে অবিভক্ত। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে আধুনিক অশ্ব এই সকল মৃত জন্তু হইতে ক্রমশঃ জন্মলাভ করিয়াছে। ফ্রান্সদেশে একপ্রকার প্রকাণ্ড হস্তী ও গণ্ডারের দেহাবশেষ মৃত্তিকামধ্যে পাওয়া গিয়াছে—এই সকল জন্তু আধুনিক হস্তী ও গণ্ডার হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন। এই সকল কঙ্কাল হইতে স্বতই প্রশ্ন উঠে—কিরূপে আধুনিককালের জন্তুরা পূর্ব্ববর্ত্তীকালের জন্তুগণের বংশধর হইতে সক্ষম হইয়াছে?

জন হণ্টার ও সেণ্ট-হিলেয়ার প্রভৃতি প্রাণিবিদ্যাবিদেরা দেখান যে সমাজাতীয় জন্তুদের হাড়ের মধ্যে অদ্ভুত ঐক্য আছে! মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তুদিগের (vertebrates) ক্ষুদ্রতম হাড়ের মধ্যেও ঐক্য দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায় যে বাদুড়ের ডানা, শুশুকের পাখনা, ঘোড়ার সামনে পা ও মানুষের হাতের গঠনপ্রণালী একইরূপ, কেবল বিভিন্নকার্য্যের উপযোগী করিবার জন্য কাহারও হাড় ছোট, কাহারও বৃহৎ, কাহারও ছড়ান, কাহারও বা গুটান। এইরূপ ঐক্য বশতঃ একই শ্রেণী হইতে ক্রমান্বয়ে এই সকল জন্তুর সৃষ্টি সপ্রমাণিত হইতেছে।

আবার অনেক জন্তুর এমন অনেক অঙ্গপ্রতঙ্গ আছে, যাহা তাহার কোনও কাজে লাগে না। অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদের (mammals) মত তিমি মাছের দাঁত আছে বটে, কিন্তু সে দাঁতগুলি কোন কাজে আসে না, কারণ সে মাড়ির

ভিতর ফুঁড়িয়া যায় নাই। একপ্রকার সরীসৃপ আছে—তাহার চামড়ার ভিতর হইতে পিছনদিকে দুইটি পা দেখা যায়, কিন্তু সে পা মাটিতে ঠেকিতে পারে না, সুতরাং কাজে লাগে না। এইরূপ অব্যবহার্য্য ইন্দ্রিয়গুলি উহারা অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদিগের নিকট উত্তরাধিকারীসূত্রে পাইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

ভন ভায়ার নামক একজন বৈজ্ঞানিক আর একটা আশ্চর্য্য তথ্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন। চতুষ্পদ (quadrupeds) প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর জীবের ভ্রূণ পুষ্ট হইবার আগে মৎস্য সরীসৃপ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর জীবের অপুষ্ট ভ্রূণের আকৃতির তুল্য। যদি প্রতেক জীব আলাহিদা করিয়া সৃষ্ট হইত তাহা হইলে কুকুর প্রথমে মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষীর আকৃতি পাইবে কেন এবং কেনই বা অপ্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয় বা অংশগুলি ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিবে ? এমন কি পুষ্ট হইবার আগে মানবের ভ্রূণ ও কুকুরের ভ্রূণ প্রায় আকৃতিতে একইরূপ।

উদ্ভিদরাজ্যেও এইরূপ ঐক্য ও পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। এক গণভুক্ত বিভিন্ন উপগণের (species) পার্থক্য এরূপ মিশাইয়া গিয়াছে যে ধরা কঠিন। ডারুইন দেখাইয়া দিলেন সে পার্থক্য এত অল্প অল্প করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে যে প্রকার (varieties) এবং উপগণের (species) মধ্যগত পার্থক্য ধরা যায় না। বিভিন্ন গোলাপ গাছ একজন সতের উপগণে বিভক্ত করিয়াছেন, আর একজন তাহাদের মধ্যে পাঁচটির বেশী উপগণ খুঁজিয়া পান নাই। আবার একশ্রেণীর উদ্ভিদ জন্তুর মত কার্য্য করে। ইহাঁরা কীটভোজী, কীটপতঙ্গ ধরিয়া খায়। তাহাদের পাতার উপরে কীটপতঙ্গ বসিলেই পাতাগুলি

আপনি মুড়িয়া যায় এবং যেমন ভোজনের সময় ও পরে প্রাণীদেহের পাকস্থলীতে পাকরস বহির্গত হয়, কীটভোজী উদ্ভিদ হইতেও সেই প্রকারের রস বহির্গত হওয়াতে কীটগুলিকে উদ্ভিদ শীঘ্রই হজম করিয়া ফেলে। এই সকল উদ্ভিদ প্রাণীরাজ্য ও উদ্ভিদরাজ্যের মধ্যবর্ত্তীভাবে সৃষ্ট হইয়াছে।

ডারুইন এই সকল তথ্য প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন

ডারুইন

করিয়াছিলেন। কত অসংখ্য পুস্তক, সাময়িক পত্র, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ যে এই সময়ে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া নিজেই ডারুইন পরে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন যে, কেমন করিয়া তিনি এত পরিশ্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহা ভিন্ন বিভিন্ন জাতীয় পায়রা পুষিয়া গাছপালা পুঁতিয়া বিস্তর পরীক্ষা করিতেন। তাঁহার গবেষণার ফলে তিনি ক্রমশঃ ক্রমপরিবর্ত্তনবাদের সত্যতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন। কিন্তু এই তথ্য প্রকাশ করিবার কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। ১৮৫৮ সালে তাঁহার বন্ধু বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ সার চার্লস লায়েলের অনুরোধে তিনি তাঁহার পরীক্ষার ফল ও সিদ্ধান্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হন। ইতিপূর্ব্বে ১৮৪৪ সালে তাঁহার অভিমত একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহাও প্রকাশ করেন নাই। এখন দেখিলেন যে তাঁহার পরীক্ষা ও গবেষণার ফল এত জমিয়া গিয়াছে যে, তাহা একখানি পুস্তকে বাহির করা অসম্ভব; সেই জন্য তিনি তাঁহার কিয়দংশ প্রকাশ করিতে মানস করিলেন।

এই সময়ে ১৮৫৮ সালে ১৮ই জুন তারিখে তিনি ওয়ালেস নামক আর একজন বৈজ্ঞানিকের নিকট হইতে কতকগুলি পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন। ওয়ালেস মালয় দ্বীপপুঞ্জে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং তাঁহার স্বকীয় গবেষণার দ্বারা তিনিও ডারুইনের উদ্ভাবিত সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন —এমন কি দুইজনের লেখাতে স্থানে স্থানে ভাষারও মিল ছিল। বলা বাহুল্য ওয়ালেস ডারুইনের কার্য্যাবলীর কোনও

সংবাদ জানিতেন না। ডারুইন এই পাণ্ডুলিপিগুলি লায়েল, হুকার প্রভৃতি তাঁহার বন্ধুদিগকে দেখাইলেন। তাঁহারা ঠিক করেন যে ওয়ালেস ও ডারুইন এই দুইজনের প্রবন্ধই একসঙ্গে পঠিত ও মুদ্রিত হইবে। উভয় প্রবন্ধই ১৮৫৮ সালে ১লা জুলাই তারিখে লিনিয়ান সোসাইটিতে পঠিত এবং ঐ সভার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই ঘটনাটি বিজ্ঞান জগতের পক্ষে শুভ হইয়াছিল, কারণ এ ঘটনাটি না ঘটিলে ডারুইনের অভিমত কোনও কালে প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহস্থল। এমন কি ১৮০০ সালে তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি একখানি পত্রে তাঁহার স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর ৪০০ বা ৫০০ পাউণ্ড দিয়া একজন পুস্তক প্রকাশকের দ্বারা এই প্রবন্ধ যেন প্রকাশ করা হয়।

ক্রমবিবর্ত্তন ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন।

১৮৫৯ সালে ২৪এ নভেম্বর তারিখে তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত "উপগণের উৎপত্তি" (origin of the species) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং সেই দিনই যত কপি পুস্তক ছাপা হইয়াছিল (১২৫০ কপি) সমস্তই বিক্রীত হইয়া যায়। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর ক্রমবিবর্ত্তনবাদ ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ (natural selection) এত উদাহরণ ও পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণিত করিয়াছিলেন যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

তাঁহার পূর্ব্বে ল্যামার্ক জীবজন্তুদিগের গঠনপ্রণালীর সাদৃশ্য দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, সমস্ত জীবজন্তু কয়েকটি আদি জীবজন্তু হইতে সৃষ্ট। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না কেহ দেখাইতে

পারেন যে কেমন করিয়া একই গণ হইতে উৎপন্ন জীবজন্তু পৃথক পৃথক হইয়াছে ততদিন ল্যামার্কের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে নাই। ল্যামার্কের বিশ বৎসর পরে ডারুইন এবং ওয়ালেস এই বিষয়ের সদুত্তর প্রদান করেন। তাঁহারা দেখাইলেন যে "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে" বৃক্ষাদি এবং জন্তুগণের মধ্যে পৃথক পৃথক উপগণের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক-গণের ধারণা ছিল যে প্রত্যেক প্রকারের বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে আলাহিদা করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদেরই বংশধর আধুনিক কালের বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু। ডারুইন ও ওয়ালেস বলিলেন যে তাহা হইতে পারে না। যাবতীয় বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু কয়েকটি বড় বড় গণে বিভক্ত এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে সেই সকল গণ হইতে বিভিন্ন উপগণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দুইটি মূলসূত্রে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(ক) প্রত্যেক বৃক্ষলতা বা জীবজন্তু বংশ রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট, কিন্তু যদি সকল বীজই রক্ষিত হয় তাহা হইলে উৎপন্ন সকল বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুকে স্থান বা আহার দান করা পৃথিবীর পক্ষে অসম্ভব। সেইজন্য যাহারা জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষা করিতে সর্ব্বাপেক্ষা সমর্থ তাহারাই জীবিত থাকিবে (survival of the fittest) বাকি সব মরিয়া যাইবে। ওয়ালেস গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে একজোড়া পক্ষীর যদি বৎসরে চারিটি করিয়া সন্তান হয় এবং তাহাদেরও আবার সন্তানাদি হইতে থাকে ও সকলগুলি জীবিত থাকে তাহা হইলে পনের বৎসরে একজোড়া পক্ষীর প্রায় বিশ কোটি বংশধর হইবে।

হাক্‌সলে সেইরূপ গণনার দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে একটি উদ্ভিদ হইতে বৎসরে মাত্র পঞ্চাশটি বীজ উৎপন্ন হইলে নয় বৎসরে তাহার বংশধরেরা সমস্ত পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিবে এবং পৃথিবীতে আর অন্য বৃক্ষের জন্য স্থান থাকিবে না। এই অসংখ্য বংশধরের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহারাই জীবিত থাকিবে। বলিষ্ঠ পিতার বংশরক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সম্ভবপর। নানা প্রাকৃতিক কারণে অধিকাংশ বৃক্ষ ও জন্তুর সন্তানগুলি মারা যায়। জলবায়ু, কীটপতঙ্গ, সংক্রামক রোগ প্রভৃতি ইহাদের মৃত্যুর প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক কারণ। একটা দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতে পারে। এক একটা তেঁতুল গাছের বৎসরে সহস্র সহস্র বীজ হয় সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু অধিকাংশ বীজই গাছের নিচে পড়ে বলিয়া, আওতায় অধিকাংশ বীজের অঙ্কুরই হয় না, যেগুলি হয় তাহারাও মরিয়া যায়। একস্থানে অনেক বীজ পড়িলে তাহারা আহার না পাইয়া অধিকাংশ মরিয়া যায়। উচ্চ পর্ব্বতে, বরফের দ্বারা আবৃত আর্টিক মহাদেশে বা মরুভূমিতে অনুপযোগী জলবায়ুর জন্য বৃক্ষলতা জন্মে না, জীবজন্তুর সংখ্যাও খুব কম। মানুষের সন্তান জননের ক্ষমতা কম, কিন্তু পঁচিশ বৎসরে মানবের সংখ্যাও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়।

(খ) সন্তানগণ পিতামাতার দৈহিক গঠন উত্তরাধিকারী-সূত্রে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বীজের তারতম্যে কোনও দুইটি সন্তান একরূপ হয় না। নানা প্রাকৃতিক কারণে এক একটি বৃক্ষলতা বা জীবজন্তুর কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়চয় সামান্য পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহা ক্রমশঃ বংশধরদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইতে থাকে।

নানা প্রাকৃতিক কারণে এইরূপে একই গণ হইতে বিবিধ উপগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ উপগণের উৎপত্তি যে সম্ভব তাহা আমরা পশুপক্ষী পালনে মানব কর্তৃক নির্ব্বাচনে (Selection by man) স্পষ্ট দেখিতে পাই। যাঁহারা পায়রা পোষেন তাঁহারা জানেন যে বিবিধ জাতীয় পায়রাকে একত্র রাখিয়া কত বিচিত্র রকমের পায়রার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকল পায়রার কোন জাতির ঝুঁটি খুব বড় ও চিক্কণ, কাহারও পাখা খুব বিস্তৃত, কাহারও ঠোঁট বড় বা ছোট, কেহ বা দূরে উড়িয়া যাইতে পারে, কেহ পারে না। এই সকল বিবিধ জাতির পায়রা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের দেহের হাড়ের ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অনেক তারতম্য হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাচনের দ্বারা গৃহপালিত কুকুরের মধ্যে নিউফাউল্যাণ্ড জাতীয় সুবৃহৎ কুকুর হইতে গ্রাম্য ক্ষুদ্র খেঁকি কুকুর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ এইরূপ নির্ব্বাচন করিয়া অশ্ব, গো, মহিষ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জন্তুর মধ্যে বিবিধ উপগণের উৎপাদন করিতে সমর্থ হন। ঘোড়া ও গাধার সহবাসে খচ্চর নামক উপগণের উৎপত্তির কথা সকলেই জানেন।

যখন দেখিতে পাইতেছি যে, মানুষ অল্প সময়ের মধ্যে নির্ব্বাচনের দ্বারা বিবিধ উপগণের সৃষ্টি করিতেছেন, তখন প্রকৃতি যে যুগযুগান্তর হইতে গণ হইতে উপগণ, উপগণ হইতে উপগণের সৃষ্টি করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? মানব অল্প সময়ের মধ্যে উপগণে যখন এত পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম, তখন প্রকৃতি নির্ব্বাচনের দ্বারা ক্রমশঃ উপগণের মধ্যে কত

বৃহৎ পরিবর্ত্তন করিতে পারে তাহা অনায়াসে বুঝা যায়—এত পরিবর্ত্তন সম্ভবপর যে ক্রমশঃ উপগণগুলি একেবারে স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ নির্ব্বাচন ও ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা পৃথিবীর অসংখ্য প্রকারের জীবজন্তু ও বৃক্ষলতার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নানা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উপায়ে প্রকৃতি নির্ব্বাচনের দ্বারা উপগণের সৃষ্টি করিতেছেন। এইরূপ কয়েকটি উপায় এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

(Natural Surroundings)

মনে করুন এক স্থানে ব্যাঘ্রের দল আছে এবং তাহাদের প্রধান আহার হরিণ। এস্থলে এই সকল ব্যাঘ্রের মধ্যে যাহারা খুব দ্রুতগামী তাহারাই হরিণ বধ করিয়া সেই আহারের দ্বারা বাঁচিয়া থাকিবে। এইরূপ দেশে দ্রুতগামী লম্বাকৃতি ক্ষীণতনু ব্যাঘ্রই প্রকৃতির নির্ব্বাচনফলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, অন্য জাতীয় ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যাইবে না। শীতদেশের জীবজন্তু বা বৃক্ষলতা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আনীত হইলে, যেগুলি বাঁচিবে, তাহাদের অনেকগুলি নূতন স্থানের ও জলবায়ুর উপযোগী হইতে চেষ্টা করিবে। তাহারা কোন্ কোনও স্থলে নূতন উপগণে পরিণত হইবে। অনেকে পাহাড়ে বেলগাছ দেখিয়া থাকিবেন—দেখিতে ছোট, শক্ত ও সাধারণ বেলগাছ হইতে কতক পরিমাণে ভিন্নাকৃতি। সমতল ক্ষেত্রজাত বেলের বীচিই পাহাড়ের উপর পক্ষীর দ্বারা

নীত হওয়াতেই এই গাছের উৎপত্তি, কিন্তু পাহাড়ে যেরূপ খাদ্য মিলে সেই খাদ্যের এবং তথাকার জলবায়ুর উপযোগী হইবার চেষ্টায় বৃক্ষটি কিয়ৎপরিমাণে ভিন্নাকৃতি হইয়াছে। এইরূপ স্থান বা জলবায়ুর দরুণ এক এক স্থানের, বিশেষতঃ সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপের বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন যে কত জটিল তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। বিলাতে হার্টইস্ ও ডাচ ক্লভার নামক দুইটি উদ্ভিদ আছে। মক্ষিকা ও কীটপতঙ্গের দ্বারা উদ্ভিদের পুং-ফুলের রেণু স্ত্রী-ফুলে আনীত হইলে সেই সঙ্গমে বীজ উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত দুইটি ফুলে অম্‌বল-বী নামক মক্ষিকাই সঞ্চরণ করে। কিন্তু ইঁদুরে এই মক্ষিকার বাসা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অপরদিকে বিড়ালে ইঁদুর ধরিয়া খায়। যে প্রদেশে বিড়াল বেশী, সেইখানে ইঁদুরের সংখ্যা কম, মক্ষিকার সংখ্যা বেশী এবং সেইজন্য ফুলও সেখানে বেশী ফুটিবে। আবার বিড়ালের সংখ্যা যেখানে কম, সেখানে ইঁদুর বেশী, সেইজন্য মক্ষিকা কম, ফুলও কম ফুটিবে। অতএব কোনও প্রদেশে উপরোক্ত দুই জাতীয় ফুলের সংখ্যা সেইস্থানের বিড়ালের সংখ্যার উপর নির্ভর করিতেছে।

ইন্দ্রিয়বিশেষের ব্যবহার ও অব্যবহার।

(Use and disuse of parts)

অনেক ইন্দ্রিয় অব্যবহারে ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায় ও ব্যবহারে পরিবর্ত্তিত হয়। যে ইন্দ্রিয় কার্য্যোপযোগী (useful) তাহাই স্থায়ী হয়। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত আমরা গৃহপালিত পশু

পক্ষীতে পাই। একই জন্তু বন্য অবস্থায় ও গৃহপালিত অবস্থায় পৃথক হয় এবং তাহাদের বংশধরগণও আরও পৃথক হইয়া পড়ে। বন্য কুক্কুট, পাতিহাঁস, রাজহাঁস প্রভৃতি পক্ষী বেশ উড়িতে পারে, গৃহপালিত অবস্থায় তাহাদের উড়িবার প্রয়োজন হয় না—সেইজন্য ক্রমশঃ তাহাদের পাখার হাড়গুলি এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে, তাহাদের বেশী দূর উড়িয়া যাইবার ক্ষমতা চলিয়া যায় এবং তাহাদের সন্তানগণ আর উড়িতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পক্ষীদিগকে প্রাণভয়ে উড়িতে হয় না বলিয়া, পাখাবিহীন বা অল্প পাখাবিশিষ্ট পক্ষীও দৃষ্ট হয়। গৃহপালিত অনেক পশুর কানগুলি নিম্নদিকে বাঁকান, কিন্তু বন্য অবস্থায় তাহাদের কান সোজা দেখা যায়। গৃহপালিত অবস্থায় তাহারা তেমন ভয় আদৌ পায় না এবং সেইজন্য কান খাড়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করাতে তাহাদের কানের হাড়গুলি এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে, কানগুলি দোমড়ান অবস্থাতেই স্বভাবতঃ থাকে। তাহাদের সন্তানগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে এইরূপ দোমড়ান কানবিশিষ্ট হইয়া থাকে। গুবুরে পোকার (Beetles) চরিবার সময় পাগুলি প্রায়ই ভাঙ্গিয়া যায়, সেইজন্য তাহাদের সন্তানগুলিতে ক্রমশঃ পা লোপ পাইয়া যায়। ওয়ালষ্টন নামক একজন সাহেব একস্থানে দেখিয়াছিলেন যে, ৫৫০ প্রকার গুবুরে পোকার মধ্যে ২০০ পোকার ডানা এত ছোট হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা উড়িতেই পারে না। এইরূপ অনাবশ্যক ইন্দ্রিয়ের অব্যবহার ও আবশ্যক ইন্দ্রিয়ের বহুল ব্যবহার বিবিধ উপাঙ্গ উৎপাদনের সহায়তা করে।

সুন্দর সুন্দর ফুলের যে বিচিত্র রং দেখিতে পাই, তাহা কেবল মানবের চক্ষুর আনন্দোৎপাদন করিবে বলিয়া সৃজিত হয় নাই, সেই বিচিত্র রং উদ্ভিদের জীবন ও বংশরক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। ফার, ওক, অ্যাশ, ঘাস প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিদের বীজ বায়ুর সাহায্যে উৎপন্ন হয়, তাহাদের ফুল রঙ্গিন হয় না। কিন্তু যে সকল উদ্ভিদের ফুলের রেণু-বহনের জন্য মক্ষিকা বা কীটপতঙ্গের সাহায্য প্রয়োজন, উহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য সেই সকল ফুলের রং বিচিত্রবর্ণের হইয়া থাকে। আম, আপেল, পেঁপে প্রভৃতি বিবিধ পক্ব ফলের বিভিন্ন রংও সেই সকল বৃক্ষলতার বংশ-রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। পক্ষী ও জন্তুগণ তাহাদের ফলের রঙের দ্বারা প্রথমে আকৃষ্ট হইবে বলিয়া তাহাদের অত রং। এইরূপ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে অনেক জন্তুর পুরুষজাতির বিচিত্র বর্ণের পাখা আছে, পুরুষ সিংহের কেশর আছে, ময়ূরের প্যাখম আছে, মোরগের ঝুঁটি আছে, কিন্তু এই সকল জন্তুর স্ত্রীজাতির এরূপ নাই। পুরুষ জন্তুদের এই সৌন্দর্য্য তাহাদের বংশরক্ষার কল্পে প্রয়োজনীয়। রূপ দেখাইয়া পুরুষ-জন্তু স্ত্রী-জন্তুর মন ভুলাইয়া তাহাদিগের সহিত সখ্য স্থাপন করে। আবার অনেক পক্ষীর স্ত্রী ও পুরুষজাতি—দুইয়েরই পক্ষের সৌন্দর্য্য আছে। সে সৌন্দর্য্য স্ত্রীপক্ষিরা পুরুষের নিকট যৌননির্ব্বাচনের (sexual selection) দ্বারা উত্তরাধিকারীসূত্রে পাইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায় যে, জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। যে ইন্দ্রিয় জীবনযাত্রার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় তাহা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে এবং নূতন উপগণের সৃষ্টি হইবে।

জারজনন।
(Intercrossing)

বিবিধ প্রকারের বৃক্ষলতা বা পশুপক্ষীর মধ্যে জারজননেও উপগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অবশ্য সকল প্রকার বৃক্ষলতা বা পশুপক্ষীর মধ্যে জারজনন আদৌ সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বে অনেক বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস ছিল যে জারজননের দ্বারা উৎপন্ন সন্তানগণের আর সন্তান হয় না। ডারুইন দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে এই সিদ্ধান্ত অনেকস্থলে সত্য নহে। উপরন্তু অনেক স্থলে জারজননের দ্বারা সন্তান আরও বেশী সবল ও সতেজ হয়। বৃক্ষলতাদের মধ্যে এই জারজনন কীটপতঙ্গ কর্ত্তৃক রেণু বহনের দ্বারা সঞ্চাবিত হয়। ডারুইন দেখিয়াছেন যে, বিভিন্ন প্রকারের কপি, মুলা, পেঁয়াজ ও অন্যান্য সবজী একসঙ্গে পুঁতিয়া তাহাদের প্রত্যেকের বীজ সংগ্রহ করিয়া সেই বীজ হইতে সবজী উৎপন্ন করিলে তাহাদের অনেকগুলি পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি এইরূপে ২৩:টি কপির চারা রোপণ করিয়া দেখিলেন যে মাত্র ৭২টি চারা ঠিক আছে, বাকি চারাগুলি হইতে উৎপন্ন ফুল কতক পরিমাণে পৃথক হইয়া গিয়াছে। শশক ও খরগোসের সংযোগে যে জার উৎপন্ন হয় তাহা বন্ধ্য (sterile) নহে, শশক বা খরগোসের সংযোগে তাহার বহু সন্তান হইয়া থাকে। সাধারণ

রাজহাঁস ও চীনদেশীয় রাজহাঁসকে প্রাণীবিদ্যাবিশারদেরা বিভিন্ন গণে ফেলিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গমে যে জার উৎপন্ন হয় তাহারও সন্তান উৎপাদনের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। গৃহপালিত বিবিধ প্রকারের পায়রা, কুকুর, গরু, মহিষের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের সংসর্গে যে সন্তান হয় তাহা আদৌ বন্ধ্য নহে। এইরূপ জারজননের দ্বারা বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষীদের মধ্যে অনেক প্রকারের উপগণের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে।

এইরূপ নানা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কারণে প্রকৃতি নির্ব্বাচন করিয়া একই গণ হইতে উপগণের সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ল্যামার্ক স্বীকার করিয়াছেন যে পশুপক্ষীগণ কয়েকটি আদি জন্তু হইতে উৎপন্ন। কিন্তু তাহার মত গ্রাহ্য হয় নাই, তাহার কারণ, তিনি দেখাইতে পারেন নাই যে কেমন করিয়া একই গণ হইতে বিবিধ পশুপক্ষীর উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। ডারুইন এই প্রশ্নের সমাধান করিলেন—প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা ক্রমশঃ জীবজন্তু ও বৃক্ষলতার মধ্যে এত পার্থক্য সম্ভবপর হইয়াছে। তিনি দেখাইলেন যে, উপগণের আর পরিবর্ত্তন হয় না, তাহারা চিরস্থায়ী (immutable)—এই মত ভ্রান্ত। আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র উপগণের যাহা গণ, তাহাই আবার বৃহত্তর গণের উপগণ। এইরূপে ডারুইন সিদ্ধান্ত করিলেন যে পশুপক্ষী এই ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে চারি পাঁচটি বৃহৎ গণ হইতে উৎপন্ন এবং বৃক্ষলতাও তদ্রূপভাবেই সৃষ্ট।

ডারুইনের এই মত প্রথমতঃ কেহই গ্রাহ্য করিলেন না। যিনি একটা বড় রকমের নূতন কথা প্রথম বলেন, তিনি

পাগলই ত বটে। ডারুইনও প্রথম প্রথম অনেক গালি খাইলেন। ক্রমশঃ লায়েল-প্রমুখ বিখ্যাত ভূবিদ্যাবিৎ, হাক্‌সলে প্রমুখ প্রাণীবিদ্যাবিৎ, হুকারের মত উদ্ভিদবিদ্যাবিদেরা তাঁহার মত গ্রহণ করিলেন। আধুনিক কালে ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মত অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা বৃক্ষলতা ও জীব সৃষ্টি সম্বন্ধে ডারুইন যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা অটুট আছে। তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রত্যেক বিজ্ঞানকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সেই সিদ্ধান্তের সত্যতা নিরূপণ করিবার জন্য কত বৈজ্ঞানিক কত নূতন পরীক্ষা করিয়াছেন এবং সেই সকল পরীক্ষার দ্বারা ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বহুল পরিমাণে উন্নত হইয়াছে।

মানবের উৎপত্তি।

(Descent of man)

ডারুইন বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষীদের জন্মবৃত্তান্ত তাঁহার "উপগণের উৎপত্তি" নামক গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। মানব শ্রেষ্ঠ জীব, সেইজন্য তাহার উৎপত্তির বিষয় একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে মানব জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও মানব অন্যান্য জীব হইতে একেবারে স্বতন্ত্র নহে।

প্রথমতঃ—মানবের দৈহিক গঠন অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর জীবের দৈহিকগঠন হইতে একেবারে পৃথক নহে। মানবশরীরের হাড়, পেশী, স্নায়ু, রক্তস্থলী প্রভৃতি বানর, বাদুড় বা সিল

মৎস্যের ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত তুলনীয়। হাক্সলে প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছেন যে, জীবের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মস্তিষ্কের গঠন প্রণালীর সহিত বানরজাতীয় জীবগণের মস্তিষ্কের গঠন প্রণালীর অনেক সাদৃশ্য আছে, তবে ঐ সাদৃশ্য একেবারে সম্পূর্ণ নহে, তাহা হইলে বানর ও মানবের বুদ্ধিবৃত্তি সমান হইত। দৈহিক গঠনে সাধারণ বানর, সিম্পাঞ্জি, ওরাং প্রভৃতি বানর জাতীয় জীবের সহিত মানবের দৈহিক গঠনের সাদৃশ্য সব চেয়ে বেশী।

অপুষ্ট ভ্রূণাবস্থায় কুকুর প্রভৃতি মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবগণের ভ্রূণ হইতে সহজে মানব-ভ্রূণের পার্থক্য অনুমিত হয় না। ক্রমশঃ একই প্রকার ইন্দ্রিয় হইতে পক্ষীর ডানা ও পা এবং মানুষেরও হাত ও পা বাহির হয়। ভ্রূণের পরিণতির সময়ই এই সকল জীবের পার্থক্য অনুভূত হয়। এইরূপ কথা অনেকের নিকট আশ্চর্য্য ঠেকিবে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক সত্য।

বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবিধ মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা মানব অবশ্য অন্যান্য জীব হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অন্যান্য জীবের যে বুদ্ধিবৃত্তি নাই বা তাহারা ভালবাসিতে, রাগিতে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে, অনুকরণ করিতে, প্রতিশোধ লইতে বা ভাবিতে একেবারেই জানে না এমন নহে। দুই একটি উদাহরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। কুকুরের প্রভুভক্তি সর্ব্বজন-বিদিত। চক্রবাক চক্রবাকীর দাম্পত্য-প্রেম কবিকল্পনা নহে, সম্পূর্ণ সত্য। জননীর সন্তানের উপর স্নেহ যেমন মানব সমাজে দেখা যায়, জীবজগতেও ঠিক সেইরূপই দৃষ্ট হয়।

বৎসহারা গাভীর করুণ রোদন যিনি শুনিয়াছেন তিনি একথা অস্বীকার করিবেন না। অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা অনেক পশুতে দৃষ্ট হয়। ময়না বা কাকাতুয়া "রাধাকৃষ্ণ" পড়ে, বানরে সাষ্টাঙ্গে সেলাম করে, বিবিধ জন্তুতে বিবিধ মানবোচিত ক্রীড়া প্রদর্শন করে। পশুদের যে চিন্তা করিবার ক্ষমতা আছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। চিঁড়িয়াখানায় হাতীর নিকট কোনও জিনিস ফেলিয়া দিলে উহা শুঁড়ের দ্বারা না পাইলে জিনিসের অপর পারে বায়ু-নিঃসরণ করিতে থাকে যাহাতে বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া জিনিসটা তাহার আয়ত্তে আইসে। একজন সাহেব ভায়েনা সহরে দেখিয়াছিলেন যে, একটি ভল্লুক নিকটবর্ত্তী জলে এক-টুকরা রুটি ভাসিতে দেখিয়া তাহা পাইবার জন্য থাবা দিয়া একটি ছোট নালা কাটিয়া জল ও তাহার সঙ্গে রুটির টুকরাও নিকটে আনয়ন করিয়াছিল।

ডারুইন জীবজন্তুদিগের এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিস্তর উদাহরণ দিয়াছেন। বানর জাতির বুদ্ধিবৃত্তি মানবের বুদ্ধিবৃত্তির অতি নিকট। অনেকে মনে করেন, মানুষই কেবল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে, কিন্তু ঠিক তাহা নহে। বন্য সিম্পাঞ্জি পাথরের দ্বারা ফল ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরের শাঁস খায়। রেংগার নামক এক সাহেব একটি বানরকে এইরূপ শক্ত কাঁচা তাল ভাঙ্গিয়া তাহার রস খাইতে শিখাইয়াছিলেন। হাতীরা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া মাছি তাড়াইতে থাকে। একবার এবিসিনিয়া দেশে একটি পার্ব্বত্য পথে ক্কোবার্গ গোথার ডিউকের সহচরেরা পর্ব্বতের উপরিস্থিত একদল বানরের

প্রতি গুলি করিতেছিলেন। বানরেরা তখন একজোটে তাঁহাদের উপর মানুষের মাথার মত বড় বড় প্রস্তরখণ্ড ফেলিয়া তাঁহাদিগকে পলায়নে বাধ্য করিয়াছিল। স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি উচ্চ মানসিক বৃত্তিও কতক কতক পরিমাণে জন্তুদের মধ্যে আছে। ডারুইনের একটি পোষা কুকুর ছিল। তিনি ইচ্ছা করিয়া উহাকে পাঁচ বৎসর বাঁধিয়া রাখিবার পর একদিন তাহার নিকট প্রত্যাগমন করিলে প্রথম কুকুরটা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না; তাহার পর হঠাৎ তাহার স্মরণ হওয়াতে ডারুইনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্বেকার মত আসিতে লাগিল। অবশ্য ভাষা মানবকে উচ্চতম জীব করিয়া রাখিয়াছে। তবে জন্তুদিগের মধ্যে ভাষার যে প্রচলন একেবারে নাই তাহা নহে। বিবিধ প্রকারের শব্দের দ্বারা তাহারা মনোভাব প্রকাশ করে। তাহাদের ক্রোধ ও ক্রন্দনের ভাষা যে স্বতন্ত্র তাহা বেশ বুঝা যায়। অবশ্য মানব যেরূপ তাহার সকল ভাবই ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে জন্তুরা তাহা পারে না। মানবের লিখিবার শক্তি চর্চ্চা ও আলোচনার ফলে। ইহার বলে তাহারা পশু হইতে বহু উচ্চে, কিন্তু অসভ্যজাতিদের লিখিত ভাষা নাই।

সৌন্দর্য্যজ্ঞান যে মানব সমাজেই নিবদ্ধ তাহা নহে। অন্যান্য অনেক জন্তুতে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। ময়ূরের সুন্দর পাখা ময়ূরীর পছন্দের জন্য, মানবের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য নহে। অনেক পুং-পক্ষী স্ত্রী-পক্ষীর মনোরঞ্জনার্থ বিবিধ প্রকারের গান করিয়া থাকে। মানবের মধ্যে এই সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও সঙ্গীতপ্রিয়তা যে সমান নহে, তাহার প্রমাণ

অসভ্যজাতির বিচিত্র পরিচ্ছদ ও বেশভূষা সভ্যজাতির নিকট আদৌ প্রিয় নহে। সকল জাতির সঙ্গীতপ্রণালী আদৌ এক নহে।

ভগবানে বিশ্বাস অনেকে মানবজাতির নিজস্ব পার্থক্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই বিশ্বাস যে মানবের অনিবার্য্য প্রবৃত্তি-মূলক তাহা নহে, কারণ ডারুইন ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে দেখাইয়াছেন যে অনেক অসভ্যজাতিদের মধ্যে ভগবানে বিশ্বাস নাই। ভগবানে বিশ্বাস ও ধর্ম্ম মানবজাতির উন্নতি ও শিক্ষার সহিত ক্রমশঃ মানব সমাজে স্থান পাইয়াছে।

পশুপক্ষীদিগের মধ্যেও সামাজিক বন্ধন কতক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা শিকার করেন তাঁহারা জানেন যে বৃহৎ নদীর চড়ে একসঙ্গে হাজার হাজার রাজহাঁস, পাতিহাঁস, পায়রা, চক্রবাক বাস করে। বানরেরা যখন বাগান লুট করিতে যায় তখন তাহারা সাধারণতঃ একজন দলপতির আদেশে কার্য্য করিয়া থাকে। একই পালে গরু, ভেড়া, ছাগল চরিতে অনেকেই দেখিয়াছেন।

এইরূপে ডারুইন দেখাইয়াছেন যে শরীরের গঠনপ্রণালী, বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক ক্রিয়াতে মানব অন্যান্য জন্তু হইতে একেবারে স্বতন্ত্র নহে। উচ্চ মানসিক বৃত্তি মানব সমাজে শিক্ষা ও সভ্যতার দরুণ খুব বেশী পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়াতে মানবকে এত উচ্চ জীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়; নহিলে আফ্রিকার অনেক অসভ্য মানব জাতি ও উচ্চশ্রেণীর বানর জাতিতে বিশেষ তফাৎ একটা নাই বলিলেও চলে। সেইজন্য ডারুইন বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে মানবই প্রথম জীবরূপে

জন্মগ্রহণ করে নাই। নিম্নশ্রেণীর জীব প্রথমে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহারা ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা ক্রমশঃ উচ্চতর জীবে পরিণত হইয়াছে। মানবের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষ উচ্চ বানর জাতি। এই বানর জাতির পূর্ব্বপুরুষ কোনও চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী জন্তু (mammal) এবং স্তন্যপায়ী জন্তুরা প্রাচীন কোন দ্বিগর্ভ পশু (marsupial) হইতে উদ্ভূত। তাহারা আবার নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কোনও উভচর (জলচর ও স্থলচর) জন্তু হইতে উদ্ভূত এবং এই উভচর জন্তুগণ মৎস্যাকৃতি জন্তু হইতে উৎপন্ন। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ এমন এক প্রকার জলজন্তু ছিল, যাহাদের শরীরে স্ত্রী এবং পুং-চিহ্ন উভয়ই বিদ্যমান এবং শরীরের কার্য্যোপযোগী প্রত্যেক ইন্দ্রিয় অসম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। *

---

* ডারুইন তাঁহার "Origin of the species" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"I believe that animals are descended from at most only four or five progeniters, and plants from an equal or lesser number. Analogy would lead me one step farther, namely, to the belief that all animals and plants are descended from one prototype. But analogy may be a deceitful guide" (p. 424.) কিন্তু পরে তাঁহার "Descent of man"এ তিনি ক্রমবিবর্ত্তনের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "We thus learn that man is descended from a hairy tailed quadruped, properly arboreal in its habits, and an inhabitant of the old world. This creature, if its whole structure had been examined by a naturalist, would have been classed amongst the Quadrumana, as surely as the still more ancient progeniters of the Old and New world monkeys. The Quadrumana and all the higher mammals are probably derived from an ancient marsupial animal, and this through a

এই ক্রমিক সৃষ্টি প্রকরণে অনেক বিষয়ের সমাধান হয়। প্রথমতঃ ভূবিদ্যাবিদেরা সর্ব্ব-প্রাচীন যুগের পর্ব্বতে কেবল মৎস্যাকৃতি জীবের, তাহার পরবর্ত্তী যুগের পর্ব্বতে ক্রমান্বয় উভচর জন্তু, পক্ষী, পশু, বানর ও মনুষ্য কঙ্কাল কেন পান তাহার মীমাংসা হয়। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে ক্রমশঃ উন্নততর জীব জন্তুর উদ্ভব হইয়াছে। যেমন সভ্যতার বৃদ্ধির দরুণ আধুনিক সমাজে কারিকর, ছুতার, দোকানদার, স্বর্ণকার প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর ব্যক্তি রহিয়াছেন, সেইরূপ ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর জীব জন্মগ্রহণ করাতে তাহাদের ইন্দ্রিয়নিচয় বিবিধ কর্ম্মোপযোগী হইয়া ক্রমশঃ সৃষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই ক্রমিক সৃষ্টিপ্রকরণ বুঝাইয়া দিতেছে—কেন মানবের হাত আর মাছের পাখনা, একজাতীয় সৃষ্ট পদার্থ। উত্তরাধিকারীসূত্রে শরীরের স্থূল স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি সকল জীব জন্তুই পাইয়াছে। সব জীবজন্তু এক ছাঁচে প্রস্তুত এরূপ মীমাংসা বিজ্ঞানসম্মত নহে।

ডারুইনের "ডিসেণ্ট অব ম্যান" নামক গ্রন্থ ১৮৭১ সালে বাহির হয়। তাঁহার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মত ইতিপূর্ব্বে

---

long line of diversified forms, from some amphibian-like creature and this again from some fish-like animal. In the dim obscutity of the past we can see that the early progeniter of all the Vertebreta must have been an aquatic animal provided with branchioe with the two sexes united in the same individual and with the most important organs of the body (such as the brain and heart) imperfectly or not at all developed. This animal seems have been more like the larve of the existing marine Ascidians than any other known form." (p. 609)

অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থে মানব-উৎপত্তির বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা বাইবেলের উপদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং অনেকে তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মদ্বেষী অধার্ম্মিক বলিয়া গালি দিলেন। কিন্তু ডারুইনের শিষ্যও অনেক হইল। তিন বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এই দুই গ্রন্থে বৃক্ষলতা, জীবজন্তুর সৃষ্টিতত্ত্ব ডারুইন যেরূপ ভাবে উদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহাতে ভূবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান নূতন আলোকে আলোকিত হইল। এখন হইতে দেখা গেল যে প্রত্যেক জন্তু বা বৃক্ষলতা পৃথক পদার্থ নহে, বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, বিশ্বের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির একটা নিগূঢ় ঐক্য আছে, তাহা সকলে বুঝিল। ভূবিদ্যাবিদ এখন হইতে গতযুগের জীবাবশেষ খুঁজিতে থাকিলেন, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদেরা প্রত্যেক বৃক্ষলতা, জীবজন্তুর শারীরিক ঐক্য ও পার্থক্য এবং তাহাদের কার্য্যাবলী মানবজীবনের কার্য্যাবলীর ন্যায় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ডারুইনের এই ক্রমবিবর্ত্তনবাদ এখন হইতে প্রত্যেক বিজ্ঞান অনুপ্রাণিত করিয়াছে। নিউটনের আবিষ্কার যেমন জড়জগতে, সেইরূপ ডারুইনের আবিষ্কার জীবজগতে বিপ্লব উপস্থিত করিল।

কেঁচোর (Earthworm) কার্য্য।

ডারুইন আরও অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছিলেন —যাহার দ্বারা অন্য কোনও বৈজ্ঞানিক ক্রমবিবর্ত্তনবাদ

প্রতিষ্ঠিত না করিয়াও বিখ্যাত হইতে পারিতেন। এইরূপ কয়েকটি বিষয়ের পরিচয় এখানে প্রদত্ত হইল। ১৮৩৮ সালে তিনি কেঁচোর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা পরিবর্ত্তিত আকারে ১৮৮১ সালে পুস্তক-রূপে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি দেখান যে কেঁচো পৃথিবীর অনেক উপকার সাধন করিতেছে। পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক-গণের ধারণা ছিল যে ঘাসের নিম্নকার মাটি সমানভাবেই থাকে। ডারুইন দেখাইলেন যে এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কেঁচো ঘাসের নিম্নস্তর হইতে ক্রমাগত মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া মাটি বদলাইয়া দিতেছে। এই উত্থিত মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে বায়ু বা বৃষ্টির দ্বারা নিম্নস্তরে নীত হইতেছে। এইরূপে মৃত্তিকাস্তর ক্রমাগত নূতন হইতেছে।

কীটভোজী উদ্ভিদ।

(Insectivorous plant)

১৮৮৫ সালে "কীটভোজী উদ্ভিদ" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে ঐ প্রকার উদ্ভিদের কার্য্যাবলির বর্ণনা করেন। এই উদ্ভিদগুলির কার্য্য অতি অদ্ভুত—অনেকটা জীবজন্তুর মত। কীট পতঙ্গ তাহার পাতায় বসিলে পাতাগুলি গুটাইয়া যায়। তাহার পর পাতা হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়। এই রসের সাহায্যে উদ্ভিদ পতঙ্গগুলিকে হজম করিয়া ফেলে। ডারুইন ১৮৬০ সালে সাসেক্স প্রদেশে বেড়াইতে গিয়া এইরূপ উদ্ভিদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরে ঐ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন।

তাহা ছাড়া তিনি একখানি গ্রন্থে সমুদ্র মধ্যস্থ "প্রবাল দ্বীপপুঞ্জের" (coral reef) উৎপত্তি সম্বন্ধে নূতন মত প্রকাশ করেন। অন্য একখানি গ্রন্থে জড়ান লতার (climbing plants) কার্য্যাবলী সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা প্রকাশ করেন। কিরূপে পরগাছা (orchid) জাতীয় গাছ কীটপতঙ্গের দ্বারা বীজাক্ত (fertilised) হয় তাহা নির্ণয় করিয়া একখানি পুস্তক লেখেন। বৃক্ষলতার মধ্যে জারজনন (cross) ও বীজজনন সম্বন্ধে আর একখানি পুস্তক লেখেন। তাহা ছাড়া আরও কয়েকখানি ভূবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থ তাঁহার অসীম কর্ম্মপটুতা, অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এইরূপ অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর অনেক দিন হইতেই ভাঙ্গিতেছিল। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি পেটের পীড়া এবং বাতে কষ্ট পাইতেছিলেন। যখন শরীর অত্যন্ত খারাপ হইত, তখন মাঝে মাঝে কাজ হইতে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য বেড়াইতে যাইতেন। বাটীতে তিনি খুব নিয়মিতাচারী ছিলেন। দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে লেখাপড়া করিতেন, এবং মাঝে মাঝে বেড়াইয়া আসিতেন। বস্তুতঃ তিনি সারাজীবন দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়াছিলেন। অত অধিক পরিমাণে মানসিক শ্রম না করিলে হয় ত তাঁহার শরীর ভাল থাকিত, কিন্তু তিনি লেখাপড়া না করিয়া থাকিতেই পারিতেন না। তাঁহার ব্যবহার খুব শিষ্ট ছিল এবং চরিত্রও মধুর ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তিনি ডাউন্ নামক পল্লীগ্রামেই আজীবন বাস করিয়াছিলেন। সেই খানেই তিনি ১৮৮২ সালে ১৯শে এপ্রিল তারিখে ৭৩ বৎসর

বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচটি পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া যান।

এই মহাপুরুষকে জীবদ্দশায় শুনিতে হইয়াছিল যে তাঁহার গবেষণার দ্বারা তিনি খৃষ্টধর্ম্মদ্বেষী ও অধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। সুখের বিষয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানবমন অনেকটা উচ্চ হইয়াছিল, নতুবা তাহার পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিলে হয়ত তাঁহাকেও গ্যালিলিওর মত কারাবাসে আবদ্ধ বা ব্রুনোর মত জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইত। মৃত্যুকালে ইংরাজ জাতি তাঁহার দেহ সুপ্রসিদ্ধ ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবীতে কবর দিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি উচিত সম্মানই দেখাইয়াছিলেন।

সমাপ্ত